POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

وَالَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ ثُمَّ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِهَا وَاٰمَنُوْٓا ۙ اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

এবং যাহারা মন্দ কাজ করে এবং ইহার পর তওবা করে এবং ঈমান আনে, নিশ্চয় তোমার প্রভুই ইহার পর অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

(সূরা আরাফ, আয়াত: ১৫৪)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 8

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 33

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 17 Aug, 2023 29 মহররম 1445 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

যে ব্যক্তি মিথ্যা কসম দিয়ে অপরের সম্পদ আত্মসাৎ করে

২৩৯৭) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি কসম খায় আর সে বিষয়ে সে মিথ্যাবাদী হয় এবং এর (কসমের) মাধ্যমে কোন মুসলমানের সম্পদ আত্মসাৎ করে, তবে এমন ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে এমনভাবে মিলিত হবে যে আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন। হযরত আশআশ (রা.) বলতেন: খোদার কসম! একথা তিনি (সা.) আমার সম্পর্কেই বলেছিলেন। (ঘটনাটি এইরূপ) আমার এবং এক ইহুদীর একটি সম্মিলিত জমি ছিল। সেই ইহুদী আমার অধিকার অস্বীকার করে বসে। আমি নবী করীম (সা.) এর সমীপে তাকে নিয়ে আসলে রসুলুল্লাহ্ (সা.) আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার কাছে কি কোন সাক্ষী আছে? আমি বললাম: না। (হযরত আশআশ) বলতেন: তিনি (সা.) সেই ইহুদীকে বললেন: কসম খাও। (হযরত আশআশ) বলতেন: আমি বললাম, হে রসুলুল্লাহ্! এ তো কসম খেয়ে নিবে এবং আমার সম্পদ নিয়ে যাবে। তখন আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াত নাযেল করেন- যারা আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার ও নিজেদের কসমের বিনিময়ে যৎকিঞ্চিত সম্পদ একত্রিত করে।

(সহীহ বুখারী, ৪র্থ খণ্ড, কিতাবুল খুসুমাত)

এই সংখ্যায়

খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ৭ জুন ২০২৩
হুযুর আনোয়ার (আই.) এর অনলাইন সাক্ষাত জলসা সালানায় প্রদত্ত ভাষণ

সুমহান দাবি إِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعًا - فَكِيْدُوْنِيْ جَمِيْعًا - سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ

এই কথাগুলি কেবল তাঁর মুখ থেকেই নিঃসৃত হয়েছে যিনি খোদা তা'লার ছত্রছায়ায় ঐশী আবরণে আবৃত হয়ে তাঁর আশ্রয়ে ছিলেন।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী

আমাদের নবী (সা.)-এর কীর্তি কতই না মহান! তিনি যখন ঘোষণা করলেন যে, তিনি একটি দায়িত্বসহকারে প্রেরিত হয়েছেন, তখন তিনি সেই কাজটি ততক্ষণ পর্যন্ত অব্যাহত রেখেছেন এবং পৃথিবী ছেড়ে চলে আসেন নি, যতক্ষণ পর্যন্ত না এই ঘোষণা শুনেছেন-

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ (আজকের দিনে আমি ধর্মকে তোমার জন্য পরিপূর্ণ করে দিলাম) যেমনটি তাঁর দাবি ছিল- إِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعًا (নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একজন রসুল) তাঁর এই দাবির কারণে তাঁর বিরুদ্ধে জগতের সমস্ত পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্র হওয়া অনিবার্য ছিল। লক্ষ্য করুন, তিনি (সা.) কি অদম্য উৎসাহ ও বীরত্বের সঙ্গে বিরোধীদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন - فَكِيْدُوْنِيْ جَمِيْعًا (তোমরা সকলে মিলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর) অর্থাৎ চেষ্টার কোন ত্রুটি রেখো না। যাবতীয় কৌশল খাটিয়ে দেখ, আমাকে হত্যা করার, বন্দী করার অথবা নির্বাসিত করার ষড়যন্ত্র কর। কিন্তু স্মরণ রেখো! سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ (অচিরেই সেই দলকে পরাভূত করা হবে এবং তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করবে) শেষমেশ আমিই বিজয়ী হব। তোমাদের সকল ষড়যন্ত্র মাটিতে মিশে যাবে। তোমরা সকলে ছত্রভঙ্গ ও দিশেহারা হয়ে পড়বে। তারা সকলে পৃষ্ঠপ্রদর্শন পূর্বক রণে ভঙ্গ দিবে।

إِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعًا এমন মহান দাবি কেউ করেনি। অনুরূপভাবে فَكِيْدُوْنِيْ جَمِيْعًا বলার দুঃসাহস কারো হয় নি। আর কারো মুখ থেকে سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ এমন কথাও বের হয় নি। এই কথাগুলি কেবল তাঁর মুখ থেকেই নিঃসৃত হয়েছে যিনি খোদা তা'লার ছত্রছায়ায় ঐশী আবরণে আবৃত হয়ে তাঁর আশ্রয়ে ছিলেন।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড,পৃ: ৪৬৯)

আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক মানুষকে সম্মান দান করেছেন, কোন জাতিবিশেষকে নয়। অতএব এক জাতি অপর জাতির সামনে যেন বড়াই না করে।

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا

সূরা বনী ইসরাইল এর ৭১ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক মানুষকে সম্মান দান করেছেন, কোন জাতিবিশেষকে নয়। অতএব এক জাতি অপর জাতির সামনে যেন বড়াই না করে। এই আয়াতে ইহুদী ও কুরায়েশকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যারা নিজেদেরকে অপরের থেকে বেশি সম্মানীয় মনে করত। আর এতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক জাতিকে সম্মান দান করেছেন, কিন্তু কিছু কিছু জাতি সেই সম্মানকে কাজে লাগায় না আর খোদা তা'লা তা'লা দ্বারা উন্মুক্তকৃত পথকে নিজেদের জন্য রুদ্ধ করে নেয়। وَحَمَلْنٰهُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ, আয়াতাংশে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে জলে ও স্থল-উভয়কে সমানভাবে আল্লাহ্ তা'লা মানুষের উন্নতির জন্য নির্ধারণ করেছেন। অতএব, কোন জাতি যদি সম্মান অর্জন করতে চায় তবে তারে সমানভাবে দুটিকেই কাজে লাগানো উচিত।

নিন্দুকদের দাবি, কুরআন করীম মহম্মদ (সা.) এর নিজের রচনা। এই স্থানে যে কথাগুলি বর্ণিত হয়েছে সেগুলিকে একজন আরববাসীর মুখ থেকে নিঃসৃত হওয়া সম্ভব? বিশেষ করে এমন এক ব্যক্তির মুখ থেকে যে কি না কখনও জলজাহাজের যাত্রা পর্যন্ত করে নি! পরিতাপ! মুসলমান জাতি বিগত কয়েক শতাব্দী থেকে এই উপদেশটি ভুলে বসে আছে আর তাদের শক্তি ক্ষীণ হয়ে পড়েছে। যদি তারা নিজেদের নৌবহরের প্রতি যত্নবান থাকত,তবে ইসলাম কখনও এতটা দুর্বল হত না যতটা এখন হয়ে পড়েছে।

فَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا আয়াত দ্বারা অনেকে একথা প্রমাণের চেষ্টা করে যে, মানুষ কিছু কিছু প্রাণী থেকে শ্রেষ্ঠ,সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ নয়। কিন্তু এমন যুক্তি সঠিক নয়। কেননা, এখানে বনী আদমের উল্লেখ করা হয়েছে জামাত হিসেবে। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে সব মানুষই সমস্ত সৃষ্টির সেরা নয়। মানুষের মধ্যে অনেকে রয়েছে ভীষণ নোংরা প্রকৃতির যা পশুর থেকেও অধম। কিছু রয়েছে সামান্য সৎ মানুষ যারা পশুদের থেকে উত্তম। কিছু আবার অতন্ত উন্নত মানের এমনকি সাধারণ ফিরিশতার থেকেও উত্তম। কিছু মানুষ আবার উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন এবং উচ্চ মর্যাদার ফিরিশতাদের থেকেও যাদের সম্মান বেশি। বস্তত, সমস্ত মানুষ সমস্ত সৃষ্টির সেরা নয়, বরং কিছু কিছু মানুষ সমস্ত সৃষ্টির সেরা আর মনুষ্য জাতি হিসেবে অধিকাংশ সৃষ্টির থেকে সেরা। কেননা, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্ররাজি, ঘোড়া, ষাঁড়, উট, ছাগল-প্রভৃতি বস্তু কাফের ও মোমেন উভয়ের কাজে লাগে এবং প্রত্যেকেই মানুষের সেবায় নিয়োজিত। অতএব, জাতি হিসেবে মানুষ সৃষ্টি জগতের অধিকাংশের থেকে শ্রেষ্ঠ এবং মানুষ পরিপূর্ণতার দিক থেকে সমগ্র সৃষ্টিজগতের শ্রেষ্ঠ জীব।

(তফসীর কবীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩৬৫)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

বি:দ্র:- সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বিভিন্ন সময়ে নিজের চিঠিতে এবং এম.টি.এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে নির্দেশনা প্রদান করেছেন, সেগুলি থেকে পাঠকদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

প্রশ্ন: খোলা গ্রহণকারী মহিলার ইদ্দত সম্পর্কে ইফতা বোর্ডের বিভিন্ন সুপারিশ হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে উপস্থাপন করা হলে তিনি (আই.) এ বিষয়ে ফিকাহ্‌র দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর ২১শে নভেম্বর, ২০১৭ তারিখের পত্রে নিম্নোক্ত উত্তর প্রদান করেন। হুযূর আনোয়ার বলেন,

উত্তর: এ বিষয়ে ফিকাহ্‌শাস্ত্রের যে দৃষ্টিভঙ্গি আমার মতেও তালাক এবং খোলার ইদ্দত ভিন্ন ভিন্ন। এ সম্পর্কে ইফতা বোর্ডের প্রতিবেদনে বর্ণিত বিভিন্ন দলিল ছাড়া একথাও দৃষ্টিপটে রাখতে হবে যে, যেভাবে তালাক ও খোলার বিবরণের মধ্যে পার্থক্য আছে একইভাবে এ সম্পর্কিত নির্দেশাবলীতেও ভিন্নতা রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা পুরুষকে তালাক দেওয়ার অধিকার দিয়েছেন আর পুরুষ যখন এই অধিকার প্রয়োগ করে তখন সাথে সাথে (মহিলার) তালাকের ইদ্দত শুরু হয়ে যায়। অপরদিকে খোলা নেওয়া নারীর অধিকার, যা সে কাযা বা বিচারবিভাগের মাধ্যমে প্রয়োগ করে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত কাযা বা বিচারবিভাগের সিদ্ধান্ত না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত ইদ্দতের সময় আরম্ভ হয় না। আর কাযা বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রম যার মধ্যে মহিলার পক্ষ থেকে আবেদন জমা দেয়া, বিচারকদের বিভিন্ন পদক্ষেপ, উভয়পক্ষের শুনানী এবং সিদ্ধান্ত ইত্যাদি এমনসব বিষয় (আছে) যার পেছনে কমপক্ষে দু'তিন মাস লেগে যায়। তাই খোলার বেলায় ইদ্দতের সময়সীমা কম রাখার পেছনে এটিও একটি প্রজ্ঞা যে, খোলা নেওয়ার পর মহিলাকে কেবল এতটুকুই বাধ্য করা হয় যাতে তিনি যে গর্ভবতী নন তা সাব্যস্ত হয়ে যায়।

এরপর হুযূর আনোয়ার (আই.) ইফতাহ্ বোর্ডের প্রতিবেদন সম্পর্কিত উপরোক্ত উত্তর ছাড়াও তালাক এবং খোলার ইদ্দতের মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে আরও আলোকপাত করতে গিয়ে বিধবার ইদ্দত সম্পর্কে বলেন,

তালাকের ইদ্দত সম্পর্কে বিশদ নির্দেশাবলী পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে যে, সাধারণ অবস্থায় ইদ্দত হবে তিন ঋতুকাল পর্যন্ত। যেমনটি বলা হয়েছে,

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ

অর্থাৎ, আর তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীরা নিজেদের তিন ঋতুস্রাবকাল পর্যন্ত বিরত রাখবে। (সূরা আল্ বাকারা: ২২৯) আর যেসব মহিলা ঋতুবতী হয় নি তাদের সম্পর্কে বলেছেন,

وَالّٰٓـِٔيْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَآئِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ ۙ وَّالّٰٓـِٔيْ لَمْ يَحِضْنَ ؕ

অর্থাৎ, আর তোমাদের স্ত্রীদের মাঝে যারা ঋতুস্রাব সম্পর্কে নিরাশ হয়ে গেছে (তাদের ইদ্দত সম্বন্ধে) যদি তোমাদের সন্দেহ হয়, তাহলে তাদের ইদ্দতকাল হল তিন মাস এবং যারা ঋতুবতী হয় নি তাদেরও (ইদ্দতকাল তিন মাস)। (সূরা আত্ তালাক: ৫)

গর্ভবতী মহিলাদের ইদ্দত সম্পর্কে বলেছেন,

وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

অর্থাৎ, আর গর্ভবতী মহিলাদের ইদ্দতকাল হল তাদের (সন্তান) প্রসব করা পর্যন্ত। (সূরা আত্ তালাক: ৫)

অপরদিকে খোলার ইদ্দতের বিধান মহানবী (সা.)-এর হাদীস ভিত্তিক। যেমনটি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.)-এর যুগে হযরত সাবেত বিন কায়েস (রা.)-এর স্ত্রী তার স্বামীর কাছ থেকে খোলা নিয়ে নেন। তখন মহানবী (সা.) তাকে এক ঋতুকাল পর্যন্ত ইদ্দত পালনের নির্দেশ দেন।

(সুনান তিরমিযী, কিতাবুত্ তালাক)

অতএব পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর বিভিন্ন হাদীসের উপরোক্ত আয়াতগুলো থেকেও প্রমাণ হয় যে, তালাক এবং খোলার জন্য পৃথক পৃথক ইদ্দত রয়েছে আর এর পেছনে বিভিন্ন প্রজ্ঞা ও কারণও রয়েছে, যা ওপরে বর্ণনা করা হয়েছে।

বিধবার ইদ্দতের যতটুকু সম্পর্ক এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন,

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا ۚ فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

অর্থাৎ, আর তোমাদের মাঝে যারা স্ত্রীদের রেখে মারা যায় তারা (অর্থাৎ স্ত্রীরা) নিজেরা যেন চার মাস দশ দিন অপেক্ষা করে। অতঃপর তারা যখন তাদের নির্ধারিত সময় পূর্ণ করে তখন তারা ন্যায়সঙ্গতভাবে নিজেদের বিষয়ে যা করবে এর জন্য তোমাদের কোনো পাপ হবে না। বস্তুত তোমরা যা কর আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে পুরোপুরি অবগত। (সূরা আল্ বাকারা: ২৩৫)

বিধবা গর্ভবতী হলে তার ইদ্দত সম্পর্কে সাহাবীদের যুগ থেকেই মতভেদ হয়ে আসছে। কাজেই, কোনো কোনো সাহাবী

وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

{অর্থাৎ, আর গর্ভবতী মহিলাদের ইদ্দতকাল হল তাদের (সন্তান) প্রসব করা পর্যন্ত, (সূরা আত্ তালাক: ৫)}। আয়াতের আলোকে এই মতামত পোষণ করতেন যে, বিধবা গভবর্তী হলে তার ইদ্দত হবে সন্তান ভূমিষ্ট করা পর্যন্ত, তা সন্তান যদি স্বামীর মৃত্যুর পরক্ষণেই ভূমিষ্ট হয় তবুও। এজন্য তারা হযরত সাবীয়াহ্ আসলামী (রা.)-এর ঘটনাকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেন। {যাতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত সাবীয়াহ্ আসলামী (রা.)-এর বিয়ে হয়েছিল হযরত সা'দ বিন খওলা (রা.)-এর সাথে, যিনি বিদায় হজ্জের সময় ইন্তেকাল করেন আর তখন সাবীয়াহ্ (রা.) সন্তানসম্ভবা ছিলেন এবং অল্পকিছুদিন পরেই তার সন্তান জন্মগ্রহণ করে। হায়েয বা রক্তপাত বন্ধ হওয়ার পর তিনি যখন সুস্থ হন তখন যারা (তাকে) বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল তাদের জন্য সাজগোজ করেন। আব্দুর দ্বার গোত্রের আবু সানাবিল বিন বা'কাক (রা.) তাকে বলেন, তুমি কি তাদের জন্য সাজগোজ করে বসে আছো যারা বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছেন, আর বিয়ে করার প্রত্যাশা করছ কি? খোদার শপথ! চার মাস দশদিন অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে তুমি কোনোভাবেই বিয়ে করতে পারবে না। হযরত সাবীয়াহ্ (রা.) বলেন, তখন আমি মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে তাঁর কাছে এ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি (সা.) আমাকে ফতওয়া দেন যে, যখন সন্তান ভূমিষ্ট হয়ে গেছে তখন তুমি স্বাধীন। আর আমি যুক্তিযুক্ত মনে করলে নিকাহ্ করতে পারি।} অথচ অন্যান্য সাহাবী যাদের মাঝে হযরত উমর, হযরত আলী এবং হযরত ইবনে আব্বাস রিযওয়ানুল্লাহি আলাইহিম রয়েছেন, তাঁদের মতে গর্ভবতী বিধবা হলে তার সন্তান ভূমিষ্ট হওয়া এবং চার মাস দশদিনের মধ্যে যেটি দীর্ঘ সময় সেটি হবে বিধবার জন্য ইদ্দতকাল।

গর্ভবতী বিধবার ইদ্দতকাল সন্তান ভূমিষ্ট হওয়া পর্যন্ত বলে যারা বিশ্বাস করেন তাদের কাছে হযরত সাবীয়াহ্ আসলামী (রা.)-এর এই ঘটনাটি ছাড়া আর কোনো দলিল নেই। এছাড়া হাদীসের গ্রন্থাবলীতে এই ঘটনার রাবীগণ বা বর্ণনাকারীগণ হযরত সাবীয়াহ্ আসলামী (রা.)-এর স্বামীর নাম, স্বামীর মৃত্যুকাল এবং মারা যাওয়ার রীতি (অর্থাৎ স্বাভাবিক মৃত্যু বা নিহত হওয়া) সম্পর্কে অধিকন্তু হযরত সাবীয়াহ্ আসলামী (রা.)-এর সন্তানসম্ভবা থাকার সময়কাল নিয়ে অগণিত মতভেদ পাওয়া যায়, যে কারণে এই ঘটনাটি বা হাদীসটির নির্ভরযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ সাব্যস্ত হয়।

এছাড়া এবিষয়টিও প্রণিধানের দাবি রাখে যে, মহানবী (সা.) এবং খিলাফতে রাশেদার যুগে সংঘটিত বিভিন্ন ইসলামী যুদ্ধে বিভিন্ন বয়সের শত শত সাহাবী শাহাদতের অমিয় সুধা পান করেছেন আর নিশ্চিতরূপে তাঁদের মধ্য হতে অনেক সাহাবী এমনও ছিলেন যাদের স্ত্রীরা তাঁদের শাহাদতের সময় সন্তানসম্ভবা ছিলেন। কিন্তু সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এমন কোনো বিধবার বিয়ে হওয়ার একটি ঘটনাও ইতিহাস ও জীবনচরিতের গ্রন্থাবলীতে পাওয়া না যাওয়া এই মতবাদকে অস্পষ্ট ও সংশয়পূর্ণ সাব্যস্ত করে। কাজেই, এই একটি ঘটনার ভিত্তিতে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত চার মাস দশ দিন ইদ্দতের সুস্পষ্ট মতবাদকে কোনোভাবেই উপেক্ষা করা যেতে পারে না।

এছাড়া হাদীসে মহানবী (সা.) কারও মৃত্যুতে শোক পালন করা সম্পর্কে সার্বজনীন নির্দেশনা প্রদান করতে গিয়ে বলেছেন যে, কারও মৃত্যুতে তিনদিনের বেশি শোক পালন করার অনুমতি নেই কেবলমাত্র বিধবা ব্যতিরেকে। অর্থাৎ সে তার স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে। (সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল জানায়েয, বাব: এহদাদিল মারআতি আলা গাইরি যওজিহা) উক্ত হাদীসেও মহানবী (সা.) গর্ভবতী মহিলার জন্য কোনো ব্যতিক্রম বলেন নি যে, সে সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত শোক পালন করবে।

একইভাবে পবিত্র কুরআনে যেখানে সন্তান প্রসবের সাথে সাথে ইদ্দত পালনের মেয়াদ শেষ করার নির্দেশ আছে সেখানে কেবলমাত্র তালাকের অবস্থার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে স্বামীর মৃত্যুর কোনো উল্লেখ করা হয় নি।

সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর পুস্তক আরিয়া ধরম- এ

وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

(সূরা আত্ তালাক: ৫) আয়াতের যে অনুবাদ করেছেন তাতে এই আয়াতকে তালাকের গণ্ডিভুক্ত করে আমাদের নির্দেশনা দিয়েছেন যে, তালাকপ্রাপ্তা নারীদের জন্য এটি পবিত্র কুরআনের নির্দেশ, বিধবাদের জন্য নয়। অতএব, হুযূর (আ.) বলেন,

وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

(সূরা আত্ তালাক: ৫) অর্থাৎ গর্ভবতী মহিলাদের তালাকের ইদ্দত হল তালাকের পর সন্তান ভূমিষ্ট হওয়া পর্যন্ত তারা দ্বিতীয় বিয়ে করা থেকে বিরত থাকবে। এতে এই প্রজ্ঞাই নিহিত আছে যে, যদি গর্ভাবস্থায় (পুনরায়) বিয়ে হয় তাহলে হতে পারে যে, অন্য পুরুষের বীর্য বা ঔরসও তার গর্ভাশয়ে থেকে যাবে আর এর ফলে বংশধারা নষ্ট হবে আর এটি জানা যাবে না যে, সেই দুটি সন্তান (বা ছেলে) কোন্ কোন্ পিতার ঔরসজাত।

(আরিয়া ধরম, রূহানী খাযায়েন, ১০খণ্ড, পৃ: ২১)

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)ও তাঁর কুরআনের দরসে সূরা আত্ তালাকের এই আয়াতের তফসীরে সন্তান ভূমিষ্ট হওয়া পর্যন্ত ইদ্দতকে তিন মাসের ইদ্দত {যা তালাকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, (স্বামী) বিয়োগের ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়} পালনকারিণী মহিলাদের প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে, চার মাস দশদিন ইদ্দত পালনকারিণী বিধবা মহিলাদের সম্পর্কে এই আদেশ বর্ণনা করেছে। অতএব হুযূর (রা.) বলেন,আর ঐসব মহিলা যারা ঋতুশ্রাব সম্পর্কে নিরাশ হয়ে গেছে। (১) বৃদ্ধা, (২) যাদের ঋতুশ্রাব শুরু হয় নি অর্থাৎ (এখনও) প্রাপ্ত বয়সে উপনীত হয় নি। (৩) যারা অসুস্থ, অর্থাৎ যাদের ঋতুকাল দশদিনের চেয়েও বেশি হয়। তাদের জন্য তিন মাসের ইদ্দত আর গর্ভবতীদের জন্য ইদ্দত হল তাদের সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত। সন্তান প্রসবের পর তাদের ইদ্দত শেষ হয়ে যায়। এ সম্পর্কে অনেকে তর্ক-বিতর্ক করেছে যে, সন্তান যদি তিন মাসের পূর্বেই জন্মগ্রহণ করে তাহলে তাহলে কি তখন ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে? কেউ কেউ বলেন, কমপক্ষে তিনমাস (ইদ্দতকাল) হবে। কিন্তু মহানবী (সা.)-এর যুগে একটি ঘটনা ঘটেছিল যে, একজন মহিলার তিন মাসের পূর্বেই সন্তান ভূমিষ্ট হয়ে গিয়েছিল আর তাকে দ্বিতীয়

জুমআর খুতবা

মহানবী (সা.) তাবু থেকে বের হতে হতে পাঠ করছিলেন,

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ - بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَدْهٰى وَ اَمَرُّ (সূরা ক্বামার: ৪৬-৪৭)। অর্থাৎ, অচিরেই এরা সকলে পরাজয় বরণ করবে এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে আর এটিই সেই মুহূর্ত যা সম্পর্কে সাবধান করা হয়েছিল আর এ মুহূর্ত খুবই কঠিন এবং খুবই তিক্ত।

প্রত্যেক জাতির ফেরাউন থাকে। এই উম্মতের ফেরাউন হল আবু জাহল।

আল্লাহ্ তা'লা তাকে মর্মান্তিক মৃত্যু দেন, আফরার দুই ছেলে এবং ফিরিশতারা তাকে হত্যা করে আর আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) তার ভবলীলা সাঙ্গ করেন।

বদরের যুদ্ধের ঘটনাবলী এবং বদরের শহীদদের সম্পর্কে আলোচনা।

হাদীসগ্রন্থ ও হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ও তাঁর খলীফাগণের বাণীর আলোকে বদরে যুদ্ধের সময় ফিরিশতাদের নাযেল হওয়ার বিষয়ে বর্ণনা।

ফিলিস্তীনের নির্যাতিত মুসলমান, মুসলমান জাতি, পাকিস্তানের আহমদী এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের জন্য দোয়ার আহ্বান।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে **মুবারকে প্রদত্ত** ৭ জুলাই , ২০২৩, **এর জুমুআর খুতবা (৭ ওফা ১৪০২ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,গত খুতবায় মক্কার কাফেরদের ওপর মুসলমানদের প্রভাব-প্রতাপের কথা উল্লেখ করে আবু জাহল এবং উতবার যুদ্ধ সম্পর্কে মতবিরোধের উল্লেখ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে আবু জাহলের খোঁটা দেয়ার কারণে উতবা যুদ্ধের ঘোষণা দেয় আর এভাবে রীতিমতো যুদ্ধ আরম্ভ হয়।

এর বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে লেখা হয়েছে যে, উতবা বিন রাবিআ তার ভাই শেবা বিন রাবিআ আর পুত্র ওয়ালীদ বিন উতবার মাঝে পায়ে হেঁটে বের হয় আর সারিগুলোর সামনেবেরিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান জানায়।

(আস সীরাতুন নবুয়ত লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৪২৬)

হযরত আলী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, উতবা বিন রাবিআ এগিয়ে আসে আর পেছনে তার পুত্র এবং ভাই আসে আর সে উচ্চস্বরে ডেকে বলে যে, কে তার মোকাবিলায় আসবে? তখন আনসারদের কতিপয় যুবক এর উত্তর দেয়। সে আনসারদের জিজ্ঞেস করে যে, তোমরা কারা? তারা তার কাছে নিজেদের পরিচয় দেয়।উতবা তাদেরকে উত্তর দেয়, তোমাদের সাথে আমাদের কোনো কাজ নেই । আমরা আমাদের চাচাতো ভাইদের সাথে যুদ্ধের সংকল্প নিয়ে এসেছি। আমরা কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ করতে চাই, অর্থাৎ মক্কাবাসীদের সাথে, আনসারদের সাথে নয়। একইসাথে উচ্চস্বরে ডেকে বলে, হে মুহাম্মদ (সা.)! আমাদের আত্মীয়দের মাঝ থেকে আমাদের সমপর্যায়ের লোকদের আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পাঠাও। এতে মহানবী (সা.) বলেন, হে হামযা! উঠো, হে আলী! উঠো, হে উবায়দা বিন হারেস! উঠো। হযরত হামযা ছিলেন তাঁর (সা.) চাচা আর আলী এবং উবায়দা উভয়ে মহানবী (সা.)-এর চাচাতো ভাই ছিলেন। হামযা উতবার দিকে অগ্রসর হন। হযরত আলী বলেন যে, আমি শেবার দিকে এগিয়ে যাই। উবায়দা এবং ওয়ালীদ পরস্পরকে আঘাত পাল্টা আঘাত করে আর উভয়েই একে অপরকে আহত করে দুর্বল করে দেয়। এরপর আমরা ওয়ালীদ-এর প্র তি মনোযোগী হই, তাকে হত্যা করে উবায়দাকে তুলে নিয়ে আসি।

(সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস-২৬৬৫) (আল লওলুউল মাকনুন সীরাত, এনসাইক্লোপিডিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৮)

তারা উভয়েই অর্থাৎ হামযা এবং আলী তাদের প্র তিপক্ষকে (পূর্বেই) হত্যা করেছিলেন। হযরত হামযা এবং হযরত আলী যখন নিজ সাথী হযরত উবায়দা বিন হারেসকে পা-কাটা অবস্থায় উঠিয়ে মুসলিম বাহিনীর মাঝে নিয়ে আসেন, এরপর তাকে যখন মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থাপন করা হয় তখন তিনি নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি কি শহীদ নই? তিনি (সা.) বলেন, নিঃসন্দেহে তুমি শহীদ।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩২)

হযরত উবায়দা যিনি মহানবী (সা.)-এর চাচাতো ভাই ছিলেন, এই আহত অবস্থা থেকে সেরে উঠতে পারেননি আর বদর থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় পথে মৃত্যু বরণ করেন।

(সীরাত খাতামান্নবীঈন, প্রণেতা-মির্যা বশীর আহমদ এম.এ, পৃ: ৩৬০)

হযরত উবায়দা বিন হারেস সম্পর্কে একটি রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে যে, যখন তার পা তরবারিতে কাটা পড়ে তখন তার সঙ্গীরা তাকে উঠিয়ে নিয়ে আসে। তাকে নিয়ে আসার পর মহানবী (সা.)-এর কাছে শুইয়ে দেওয়া হয়। মহানবী (সা.) নিজ পবিত্র পা তার নীচে রেখে দেন অর্থাৎ নিজের পা তার পায়ের নীচে রেখে দেন। উবায়দা একান্ত ভালোবাসার সাথে তাঁর (সা.) প্রতি তাকিয়ে নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আজ যদি আবু তালেব জীবিত থাকতেন তাহলে জানতে পারতেন যে, আমি তার কথার পরিপূরণস্থ ল হওয়ার অধিক যোগ্য। এরপর তিনি হযরত আবু তালেবের পঙক্তি পড়েন যার অর্থ হলো, বায়তুল্লাহ্‌র কসম, তুমি মিথ্যা বলেছো যে, মুহাম্মদ (সা.)-কে নিঃসঙ্গ পরিত্যাগ করা হবে। তাঁর সুরক্ষার্থে আমরা এখনও বর্শাও চালাইনি আর তিরন্দাজিও করিনি। আর তুমি মিথ্যা বলেছো যে, আমরা তাঁকে তোমাদের হাতে তুলে দেবো, যতক্ষণ না তাঁর চতুষ্পার্শ্বেআমাদের লাশ পড়ে আর আমরা আমাদের পুত্র ও কন্যাদের সম্পর্কে উদাসীন হবো। এতে রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি শহীদ।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩৫-৩৬) (উসদুল গাবাহ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৫৪৮)

এই উপলক্ষ্যে আবু জাহল একটি দোয়া করেছিল যার উল্লেখ এভাবে দেখা যায়।

উভয় সেনাদল যখন পরস্পর মুখোমুখি হয়, অর্থাৎ প্রচণ্ড লড়াই আরম্ভ হয়, তখন আবু জাহল দোয়া করে যে, হে খোদা! আমাদের মাঝে যে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে আর এমনসব কথা বলে যা আমরা পূর্বে কখনো শুনিনি আজ তাকে ধ্বংস করো।

(সীরাত ইবনে হিশাম, পৃ: ৪২৮)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ সম্পর্কে লিখেন যে, বদরের যুদ্ধের সময় আমর বিন হিশাম নামের এক ব্যক্তি, যার নাম পরবর্তীতে আবু জাহল হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়, যে কুরাইশ কাফেরদের নেতা ও দলপতি ছিল, সে এভাবে দোয়া করে যে, اَللّٰهُمَّ مَنْ كَانَ مِنَّا اَفْسَدَ فِي الْقَوْمِ وَاَقْطَعَ لِلرَّحِمِ فَاَحِنْهُ الْيَوْمَ (উচ্চারণ: 'আল্লাহুম্মা মান কানা মিন্না আফসাদা ফিল কওমে ওয়া আক্বতাআ লির্‌রাহমে ফাআহিনহুল ইয়াওম') অর্থাৎ, হে খোদা! আমাদের উভয়ের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি [(এই শব্দ দ্বারা সে নিজেকে ও মহানবী (সা.)-কে বুঝিয়েছিল)] তোমার দৃষ্টিতে

নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী আর জাতির মাঝে বিভেদ সৃষ্টিকারী হয় এবং জাতিগত অধিকার পদদলিত করে আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট করার কারণ হচ্ছে, আজ তুমি তাকে ধ্বংস করে দাও। এসব কথার মাধ্যমে আবু জাহল একথা বুঝতে চাচ্ছিল যে, নাঊযুবিল্লাহ্ মহানবী (সা.) একজন নৈরাজ্যবাদী মানুষ আর জাতির মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে কুরাইশদের মাঝে এক অন্যায় দলাদলি সৃষ্টি করছেন, অধিকন্তু তিনি সমস্ত অধিকার পদদলিত করেছেন আর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার কারণ হয়েছেন। আবু জাহল এটিই বিশ্বাস করত বলে মনে হয় যে, নাঊযুবিল্লাহ্ মহানবী (সা.)-এর জীবন পূত-পবিত্র নয়, তবেই তো সে বিগলিত চিত্তে দোয়া করেছে। কিন্তু এই দোয়ার পর হয়ত এক ঘন্টাও জীবিত থাকতে পারেনি আর খোদার ক্রোধ সেই স্থানেই তার মস্তক ছিন্ন করে ছুড়ে ফেলে দেয়। যার পবিত্র জীবনে সে কালিমা লেপন করতে চেয়েছিল তিনি এই ময়দান থেকে সাফল্য ও বিজয় নিয়ে ফিরে আসেন। ”

(চাশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ১৭৪-১৭৫)

যুদ্ধের চিত্র এক স্থানে এভাবে অঙ্কন করা হয়েছে যে, যুদ্ধের ময়দানে তুমুল লড়াই চলছিল। মুসলমানদের সামনে তাদের চেয়ে তিনগুণ (বড়) সেনাদল ছিল যারা সকল প্রকার সমরাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে এই সংকল্প নিয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছিল যে, ইসলামের নাম-চিহ্ন মুছে দেওয়া হবে। পক্ষান্ত রে বেচারা মুসলমানরা সংখ্যায় স্বল্প, যুদ্ধোপকরণে স্বল্প, দারিদ্র্য ও দেশান্তরের কষ্টে জর্জরিত, বাহ্যিক উপকরণের দিক থেকে মক্কাবাসীদের সামনে কয়েক মিনিটের শিকার ছিল। কিন্তু তৌহীদ ও রিসালতের ভালোবাসা তাদেরকে বিভোর করে রেখেছিল আর সেই জিনিস যার চেয়ে অধিক শক্তিশালী পৃথিবীতে আর কিছু নেই, অর্থাৎ জীবন্ত ঈমান তাদের মাঝে এক অসাধারণ শক্তি সঞ্চার করেছিল। তারা তখন যুদ্ধের ময়দানে ধর্ম সেবার সেই আদর্শ উপস্থাপন করছিলেন যার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রত্যেকে অপরের চেয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল আর (তাদেরকে) খোদার পথে জীবন বিলিয়ে দিতে উদগ্রীব মনে হতো। হামযা ও আলী এবং যুবায়ের শত্রুদের সারির পর সারি ছিন্নভিন্ন করে দেন।”

(সীরাত খাতামান্নবীঈন, প্রণেতা- মির্যা বশীর আহমদ এম. এ, পৃ: ৩৬২)

মুসলমানদের প্রথম শহীদ সম্পর্কে লেখা আছে যে, হযরত উমর বিন খাত্তাব-এর মুক্ত ক্রীতদাস হযরত মেহজাকে একটি তিরের নিশানা বানানো হয় যাতে তিনি শহীদ হন।তিনি মুসলমানদের প্রথম ব্যক্তি ছিলেন যিনি শাহাদতের পেয়ালা পান করেন। এরপর বনী আদী বিন নাজ্জার গোত্রের এক ব্যক্তি হযরত হারেসা বিন সুরাকা শাহাদত বরণ করেন। তিনি চৌবাচ্চা থেকে পানি পান করছিলেন এমতাবস্থায় তাকে লক্ষ্য করে একটি তির নিক্ষেপ করা হয় যা তার ঘাড়ে বিদ্ধ হয় আর এভাবেই তিনি শাহাদতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন।

(সীরাত ইবনে হিশাম, পৃ: ৪২৮)

হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, হারেসা (রা.) বিন সুরাকা বিন হারেস বদরের যুদ্ধে শহীদ হন আর তিনি সবেমাত্র যৌবনে পদার্পন করেছিলেন। তার মাতা হযরত আনাসের ফুপি, রুবাইয়্যা বিনতে নযর, মহানবী (সা.)-এর কাছে আসেন। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! হারেসা (রা.)-এর যে মর্যাদা আমার দৃষ্টিতে ছিল তা আপনি জানেন। সে যদি জান্নাতে থাকে তাহলে আমি ধৈর্য ধরবো এবং পুণ্যের আশা রাখবো। যদি ভিন্ন কিছু হয়ে থাকে তাহলে আপনি দেখবেন যে, আমি কী করি। মহানবী (সা.) বলেন, পরিতাপ! তুমি কি উন্মাদ? জান্নাত কি একটিই? তিনি (সা.) বলেন, অনেক জান্নাত আছে এবং তোমার পুত্র তো জান্নাতুল্ ফিরদাউসে রয়েছে।

(সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, হাদীস-৩৯৮২)

এই যুদ্ধে সাহাবীদের মাঝে জিহাদের যে উদ্দীপনা দেখা গেছে, সে সম্পর্কে লেখা হয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি আজ পুণ্য জ্ঞান করে ধৈর্যের সাথে যুদ্ধ করবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালাবে না; আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। একথা শুনে বনী সালমা গোত্রের সদস্য উমায়ের বিন হুমাম (রা.), যিনি তখন খেজুর খাচ্ছিলেন, তার হাতে তখন কয়েকটি খেজুর ছিল, বলেন, বাহ্ বাহ্! আমার এবং জান্নাতের মাঝে কেবল এতটুকুই ব্যবধান? অর্থাৎ এরা আমাকে হত্যা করতে যতটা সময় লাগে কেবল ততটা? এরপর তিনি নিজের তরবারি হাতে নিয়ে প্রচণ্ড রণে ঝাপ দেন আর শহীদ হয়ে যান।

আফরার পুত্র ছিলেন অওফ বিন হারেস (রা.)। তিনি মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আল্লাহ্ তা’লা তাঁর বান্দার কোন্ কাজে খুশি হন? তিনি (সা.) বলেন, বর্ম ও যুদ্ধের পোশাকবিহীন অবস্থায় শত্রুকে হত্যা করাতে। তখন তিনি (রা.) তার বর্ম খুলে ফেলে দেন এবং অনেক কাফেরকে হত্যা করার পর নিজেও শহীদ হয়ে যান।

(সীরাত ইবনে হিশাম, পৃ: ৪২৮)

আবু জাহলের নিহত হওয়া সম্পর্কে বুখারীতে যে রেওয়ায়েত রয়েছে সে অনুযায়ী হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমি বদরের যুদ্ধের দিন সারিতেদাঁড়িয়ে ছিলাম। আমি দৃষ্টিপাত করে দেখি আমার ডানে ও বামে দু’জন অল্প বয়স্ক যুবক (দাঁড়িয়ে) আছে। তাদের উপস্থি তিতে আমি নিজেকে যেন নিরাপদ ভাবতে পারিনি। অর্থাৎ এরা হলো দুজন বালক বা কিশোর, এরা কীভাবে আমার সুরক্ষা করবে? তাই আমি (নিজেকে)নিরাপদ মনে করিনি। এরই মধ্যে তাদের মধ্য হতে একজন চুপি চুপি আমাকে জিজ্ঞেস করে, (যেন তার অন্য সঙ্গী জানতে না পারে যে,) চাচা! আমাকে আবু জাহলকে দেখিয়ে দিন? আমি বললাম, হে আমার ভাতিজা তার সাথে তোমার কি কাজ? সে বলে, আমি আল্লাহ্র সাথে এই অঙ্গীকার করেছি যে, আমি যদি পাই তাহলে তাকে হত্যা করবো অথবা তার সামনে নিজেই মারা যাবো। এরপর অন্য কিশোর চুপি চুপি একই কথা জিজ্ঞেস করে, যা তার অন্য সাথী জানতে পারেনি। হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) পরে বলতেন, আমি যদি দু’জন শক্ত সমর্থ পুরুষের মাঝে থাকতাম তাহলে এতটা আনন্দিত হতাম না। প্রথমে কিন্তু তাদের এই উদ্দীপনা সত্ত্বেও তিনি (রা.) আশ্বস্ত হতে পারছিলেন না। (প্রথমে)তিনি তার ডানে বামে দু’জন শক্ত সমর্থ মানুষ আশা করছিলেন। তিনি (রা.) বলেন, আমি তাদের দু’জনকে আবু জাহলের প্রতি ইশারা করে বলি, ঐ হলো (আবু জাহল)। একথা শোনামাত্রই তারা দু’জন বাজ পাখির মতো তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাকে হত্যা করে। তারা উভয়েই ছিল আফরার পুত্র মাআয এবং মুয়াওয়েয।

(সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস-৩৯৯৮৮) (উমদাতুল কারী, ১৭ম খণ্ড, পৃ: ১৩২)

হযরত মাআজ বলেন, আমি লোকজনকে বলতে শুনি যে, আবুল হাকামের কাছে কেউ পৌঁছতে পারবে না। অতএব, আমি সংকল্পবদ্ধ হই যে, আমি অবশ্যই তার ওপর হামলাকরবো। আমি তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি এবং তরবারির এক আঘাতে তার পায়ের গোছা পর্যন্ত কেটে ফেলি। তার ছেলে ইকরামা আমার কাধের ওপর আক্রমণ করে এবং আমার হাত কেটে ফেলে। হাতটি কেবল চামড়ার সাহায্যে আমার বাহুর সাথে ঝুলে ছিল। পুরো দিন সেভাবেই আমি যুদ্ধ করতে থাকি যখন বেশি কষ্ট হচ্ছিল তখন আমি এর ওপর পা রেখে সেটিকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলি।

(তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৬)

যুদ্ধ শেষ হলে মহানবী (সা.) নিহতদের মাঝে দাঁড়ান এবং আবু জাহলকে সন্ধান করা শুরু করেন। তিনি (সা.) তাকে খুঁজে না পেয়ে এই দোয়া করেন, اَللّٰهُمَّ لَا تُعْجِزْنِيْ فِرْعَوْنَ هٰذِهِ الْاُمَّةِ (উচ্চারণ: ‘আল্লাহুম্মা লা তু’জিযনি ফিরআউনা হাযিহিল উম্মাতে’) অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে এই উম্মতের ফেরাউনের বিপরীতে ব্যর্থ কোরো না। সে যেন জীবিত পালাতে না পারে। এরপর লোকজন তাকে খুঁজতে শুরু করে এবং হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.) তাকে খুঁজে পান।

(আসসীরাতুল হালবিয়া, বাব যিকার মাগাযিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৩৬)

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, মহানবী (সা.) দোয়া করেন, হে খোদা! এমন যেন না হয় যে, সে তোমার হাত হতে ফস্কে যাবে।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৬)

মহানবী (সা.) যখন আবু জাহলের লাশ খুঁজে বের করার নির্দেশ প্রদান করেন তখন হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.) নিহতদের মধ্যে অনুসন্ধান করতে করতে তার কাছে আসেন। মহানবী (সা.) বলেছিলেন, যদি তুমি তার সন্ধান না পাও তবে তার হাঁটুতে একটি আঘাতের চিহ্ন দেখে তাকে সনাক্ত করতে পারবে। কেননা একবার আব্দুল্লাহ্ বিন জুদ’আনের বাড়িতে একটি নিমন্ত্র ণের সময় আমি তাকে সজোরে ধাক্কা দিয়েছিলাম ফলে সে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায় এবং তার হাঁটুতে আঘাত লাগে। সেই চিহ্ন এখনও তার হাঁটুতে বিদ্যমান। ইবনে মাসঊদ (রা.) বলেন, সেই চিহ্নের মাধ্যমেই আমি তাকে চিনতে পারি এবং তখনও তার মাঝে কিছুটা প্রাণের স্পন্দন বাকি ছিল। আমি তার গলার ওপরে পা রাখি, কেননা মক্কায় সে আমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছিল। আমি বলি, হে খোদার শত্রু! তুই কি দেখেছিস, খোদা তোকে কীভাবে লাঞ্ছিত করেছেন!

সে বলে, কোন্ বিষয় আমাকে লাঞ্ছিত করেছে? একজন মানুষকে তোমরা হত্যা করেছো, এতে এমন কী হয়েছে! তোমরা কি আজ পর্যন্ত এমন কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করেছো যে আমার চেয়ে অধিক সম্মানিত ও মর্যাদাবান। ঠিক আছে, আগে বলো; কার বিজয় হয়েছে? হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.) বলেন, আবু জাহল তার জীবনের অন্তিম মুহূর্তে যখন কিনা আমি তার গলার ওপরে পা রেখেছিলাম তখন সে বলেছিল, হে সামান্য মেষ পালক! তুই এমন জায়গায় আরোহণ করেছিস যেখানে তোর আরোহণ করা উচিত হয় নি। আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.) বলেন, এরপর আমি তার শিরোচ্ছেদ করি এবং মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিয়ে এসে তাঁর (সা.)-এর চরণে নিক্ষেপ করি এবং নিবেদন করি যে, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! এটি হলো খোদার শত্রু আবু জাহলের মস্তক। মহানবী (সা.) খোদা তা’লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং বলেন, ‘আল্লাহুল্লাযী লা ইলাহা গায়রুহু’। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা’লাই সেই পবিত্র সত্তা যিনি ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই। এটি ইবনে হিশামের রেওয়ায়েত।

(সীরাত ইবনে হিশাম, পৃ: ৪৩৩, দারুল কিতাবুল ইলমিয়া, বেইরুত, ২০০১) (শারাহ যারকানি, ২য় খণ্ড,পৃ: ২৯৭)

আরেকটি রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.) আবু জাহলকে হত্যা করার পর মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন এবং আবু জাহলকে হত্যা করা সম্পর্কে অবগত করেন। তখন মহানবী (সা.) তার সাথে পায়ে হেঁটে যান এবং বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! যিনি ব্যতীত অন্য কেউ উপাসনার যোগ্য নেই। আমিও নিবেদন করি, আল্লাহ্‌র কসম! তিনি ছাড়া অন্য কেউ উপাসনার যোগ্য নেই। এরপর মহানবী (সা.) আবু জাহলের লাশের পাশে দাঁড়ান এবং বলেন, হে আল্লাহ্‌র শত্রু! সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌রই; যিনি তোমাকে লাঞ্ছিত করেছেন।

(মুসনাদ ইমাম আহমদ বিন হাম্বাল, পৃ: ১৬৫, রেওয়ায়েত নম্বর-৪২৪৬)

হযরত কাতাদাহ্ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেন, প্রত্যেক উম্মতেরই ফেরাউন রয়েছে। আর এই উম্মতের ফেরাউন হলো, আবু জাহল। আল্লাহ্ তা'লা তাকে মারাত্মকভাবে হত্যা করেছেন। আফরার দুই পুত্র এবং ফেরেশ্‌তারা তাকে হত্যা করেছে আর আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ তার ভবলীলা সাঙ্গ করেছেন।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৫২)

হযরত আক্বদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আবু জাহলকে ফেরাউন বলা হয়েছে। কিন্তু আমার মতে সে ফেরাউনের চেয়েও নিকৃষ্ট। ফেরাউন তো পরিশেষে বলেছিল, اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِیْۤ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْۤا اِسْرَآءِیْلَ । অর্থাৎ 'আমি ঈমান আনলাম যে, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, যাঁর প্রতি বনী ইস্রাঈল ঈমান এনেছে (সূরা ইউনুস: ৯১)। কিন্তু সে শেষ পর্যন্ত ঈমান আনেনি। মক্কায় সে-ই সকল নৈরাজ্যের হোতা ছিল আর চরম অহংকারী, আত্মম্ভরি আর মর্যাদা ও সম্মানের বাসনা পোষণকারী ছিল। "

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৪৭)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "মোটকথা মহানবী (সা.) হযরত মূসা (আ.)-এর ন্যায় নিজ জাতির পুণ্যবান সদস্যদেরকে হিংস্র পশু ও রক্ত পিপাসুদের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছেন আর মূসা (আ.)-এর ন্যায় তাদেরকে মক্কা থেকে মদিনায় বের করে এনেছেন আর আবু জাহল, যে এই উম্মতের ফেরাউন ছিল, তাকে বদরের যুদ্ধে ধ্বংস করেছেন।"

(তিরইয়াকুল কুলুব, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৫,পৃ: ৫২৩)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, বদরের যুদ্ধের সময় মক্কার কাফেররা যখন এলো তারা তখন ধরে নিল যে, বাস! আমরা তো এখন মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চলেছি। আর আবু জাহল বলে, আমরা ঈদ উদ্‌যাপন করব এবং অনেক মদ পান করব আর পণ করল, আমরা মুসলমানদেরকে হত্যা করে তবেই ক্ষান্ত হবো। কিন্তু সেই আবু জাহলকেই মদিনার দুই বালক হত্যা করে [মক্কার কাফেররা মদিনাবাসীদের তুচ্ছজ্ঞান করত এবং তাদেরকে আরায়ী বলতো, অর্থাৎ সব্জি চাষী, কৃষীজীবি, যুদ্ধ সম্বন্ধে এরা কী জানে!]। মোটকথা সেই দুই বালক তাকে হত্যা করে আর তাকে এমন আক্ষেপের সাথে বিদায় নিতে হয় যে, তার অন্তিম ইচ্ছাটুকুও পূর্ণ হয়নি। আরবের রীতি ছিল, কোনো নেতা বা সর্দার যুদ্ধে নিহত হলে তার ঘাড় লম্বা করে কাটা হতো যেন চেনা যায় যে, সে একজন সর্দার ছিল। আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.) তাকে (তথা আবু জাহলকে) অসার হয়ে আহত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করেন, তোর অবস্থা কী? সে বলে, আমার অন্য কোনো দুঃখ নেই, দুঃখ কেবল এতটুকু যে, মদিনার দুজন আরায়ী (কৃষকের সন্তান) আমাকে হত্যা করল। হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা.) জিজ্ঞেস করেন, তোমার কোনো অন্তিম ইচ্ছা আছে কী? সে বলল, আমি চাই, আমার ঘাড় একটু লম্বা করে কাটো। তিনি (রা.) বলেন, আমি তোর এই অন্তিম ইচ্ছাও পূর্ণ হতে দেবো না। একথা বলে তার গর্দান চিবুকের পাশ থেকে শক্ত হাতে কেটে ফেলেন। আর সে যে ঈদ উদ্‌যাপন করতে চাচ্ছিল তা তার মাতমের কারণ হয় আর সেই মদ যা সে ইতিপূর্বে পান করেছিল, সেটিহজম করার ভাগ্যও তার হয়নি।"

(খুতবাতে মাহমুদ, ১ম খণ্ড, পৃ: ১১)

মুশরেকদের উদ্দেশ্যে মহানবী (সা.)-এর কঙ্কর নিক্ষেপের ঘটনা সহীহ্ বুখারীতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) যখন তঁাবুতে দোয়া করছিলেন তখন হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর (সা.) হাত ধরে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এখন ক্ষান্ত দিন। আপনি আপনার প্রভুর কাছে অনেক বেশি কাকুতিমিনতি করেছেন।

মহানবী (সা.) বর্ম পরিহিত ছিলেন আর তাবু থেকে বের হতে হতে পাঠ করছিলেন, سَیُهۡزَمُ الۡجَمۡعُ وَیُوَلُّوۡنَ الدُّبُرَ ؕ بَلِ السَّاعَةُ مَوۡعِدُهُمۡ وَالسَّاعَةُ اَدۡهٰی وَاَمَرُّ (সূরা ক্বামার: ৪৬-৪৭)। অর্থাৎ, অচিরেই এরা সকলে পরাজয় বরণ করবে এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে আর এটিই সেই মুহূর্ত যা সম্পর্কে সাবধান করা হয়েছিল আর এ মুহূর্ত খুবই কঠিন এবং খুবই তিক্ত।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সেইর, হাদীস-২৯১৫)

সীরাত খাতামান্নাবিয়্যিন পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম.এ. (রা.) এর বিস্তারিত বিবরণ দিতে গিয়ে লেখেন, বস্তুত মুহাজের হোক বা আনসার, সব মুসলমান মিলে পূর্ণ উদ্দ্যমে আন্তরিকতার সাথে যুদ্ধ করে। কিন্তু শত্রুপক্ষের সংখ্যাধিক্য এবং তাদের সাজসরঞ্জামের আধিক্যের সামনে মুসলমানরা ছিল নিরুপায় আর একটা সময় পর্যন্ত যুদ্ধের ফলাফল ছিল অনিশ্চিত। মহানবী (সা.) একাধারে দোয়া ও আহাজারি করছিলেন এবং তাঁর (সা.) উৎকণ্ঠা ক্ষণে ক্ষণে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। অবশেষে এক দীর্ঘ সময় পর তিনি সিজদা থেকে মাথা তোলেন এবং ঐশী সুসংবাদ سَیُهۡزَمُ الۡجَمۡعُ وَیُوَلُّوۡنَ الدُّبُرَ বলতে বলতে তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসেন।"

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা- মির্যা বশীর আহমদ এম.এ, পৃ: ৩৬২-৩৬৩)

ইমাম রাযী সূরা আনফালের, وَمَا رَمَیۡتَ اِذۡ رَمَیۡتَ وَلٰکِنَّ اللّٰهَ رَمٰی (সূরা আনফাল-৪২) আয়াতের তফসীর করতে গিয়ে বলেন, কুরাইশরা যখন ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন মহানবী (সা.) দোয়া করেন, হে আল্লাহ্! এই কুরাইশ গোত্র ঘোড়া ও যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম সহ এমন দম্ভ নিয়ে এসেছে যে, তারা তামার রসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে এবং মিথ্যাবাদী আখ্যা দিচ্ছে।

হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে তা-ই চাচ্ছি যার বিষয়ে তুমি আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে।

তখন জিব্রাঈল (আ.) অবতীর্ণ হন এবং বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! এক মুষ্টি মাটি নিন এবং এই কাফিরদের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করুন। এরপর যখন উভয় সেনাদল পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হয় তখন তিনি (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে বলেন, উপত্যকার কঙ্কর মিশ্রিত এক মুষ্টি মাটি দাও। তা তিনি সেসব কাফিরের চেহারালক্ষ্য করে নিক্ষেপ করেন এবং বলেন, 'শাহাতিল উজুহ' অর্থাৎ, চেহারা বিকৃত হয়ে যাক। তখন মুশরিকরা নিজেদের চোখ কচলাতে থাকে যার ফলে তারা পরাজিত হয়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, وَمَا رَمَیۡتَ اِذۡ رَمَیۡتَ وَلٰکِنَّ اللّٰهَ رَمٰی (সূরা আনফাল: ৪২)। অর্থাৎ, কঙ্কর মিশ্রি ত মাটি, যেটি আপনি নিক্ষেপ করেছেন প্রকৃতপক্ষে আপনি নিক্ষেপ করেন নি। কেননা তাঁর নিক্ষেপ করা ততটুকুই প্রভাব বিস্তার করতে পারে যতটুকু একজন মানুষের নিক্ষেপ করা প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম। বরং আল্লাহ্ তা'লা সেটি নিক্ষেপ করেছেন যার ফলে এই মাটির কণাগুলো তাদের চোখ পর্যন্ত পৌঁছায়। বাহ্যত মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমেই কঙ্কর নিক্ষিপ্ত হয় কিন্তু এর ফলাফল আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয়। (তফসীর আল কবীর, প্রণেতা- ইমাম রাজি, ৮ম খণ্ড, ৮ম ভাগ, পৃ: ১১২)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এই রণক্ষেত্রের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেন,তাঁবু থেকে বেরিয়ে তিনি (সা.) চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখেন রণক্ষেত্রে তুমুল লড়াইও রক্তক্ষয় চলছে। সে সময়ে তিনি কঙ্কর ও বালু মিশ্রিত এক মুষ্টি মাটি উঠান এবং কাফিরদের লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারেন এবং উচ্চস্বরে বলেন, 'শাহাতিল উজুহ্'-শত্রুদের চেহারা বিকৃত হয়ে গেছে। একইসাথে মুসলমানদের ডেকে বলেন, একযোগে আক্রমন করো। মুসলমানদের কর্ণকুহরে নিজেদের প্রিয় নেতার আওয়াজ পৌঁছতেই তারা নারায়ে তকবীর বলে একযোগে আক্রমন করে। অপরদিকে তাঁর একমুষ্টি কঙ্কর ছুঁড়তেই এমন ধুলিঝড় শুরু হয় যাতে কাফিরদের নাক, চোখ ও মুখ বালি ও পাথরের টুকরো দ্বারা ভরে যায়। তিনি (সা.) বলেন, এটা খোদার ফিরিশ্‌তাদের দল যারা আমাদের সাহায্যের জন্য এসেছে। রেওয়াতে বর্ণিত হয়েছে সে সময় কিছু লোক ফিরিশ্‌তাদের দেখেছে। যাহোক উতবা, শেবা এবং আবু জাহলের মতো কুরাইশ নেতারা তো ধুলিস্যাৎ হয়ে গিয়েছিল। মুসলমানদের এই আকস্মিক ধাওয়া এবং ঝড়ের ঝাপটায় কুরাইশের পা উপড়ে যেতে থাকে এবং স্বল্প সময়ের ভেতর কাফিরদের বাহিনীতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং কিছুক্ষণের মাঝেই যুদ্ধক্ষেত্র ফাঁকা হয়ে যায়।"

(সীরাত খাতামান্নবীঈন, প্রণেতা-মির্যা বশীর আহমদ এম. এ, পৃ: ৩৬৩)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "লেকা' (খোদা দর্শন)-এর এই পর্যায়ে কখনো কখনো মানুষের দ্বারা এমনসব অলৌকিক ঘটনা সাধিত হয়যা মানবীয় শক্তির ঊর্ধ্বে বলে প্রতীয়মান হয় এবং ঐশী শক্তির বৈশিষ্ট্য নিজের মাঝে রাখে। যেভাবে আমাদের নেতা ও মনিব, শ্রেষ্ঠ রসূল হযরত খাতামুল আম্বিয়া (সা.) বদরর যুদ্ধে কঙ্করের এক মুষ্টি কাফিরদের ওপর নিক্ষেপ করেন এবং সেই মুষ্টি দোয়ার মাধ্যমে নয় বরং নিজ আধ্যাত্মিক শক্তি বলে নিক্ষেপ করেন। কিন্তু সেই মুষ্টি ঐশী শক্তি প্রদর্শন করে এবং বিরোধী সেনাদলের ওপর এমন অলৌকিক প্রভাব পড়ে যে, তাদের মাঝে এমন কেউ ছিল না যার চোখে এর প্রভাব পড়ে নি। আর তারা সবাই অন্ধের মতো হয়ে যায়। এমন আত ঙ্ক ও ভীতি তাদের মাঝে দেখা দেয় যে, তারা উন্মাদের ন্যায় পালাতে থাকে। এই অলৌকিক নিদর্শনের

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

দোয়ার জন্য হৃদয় যখন বেদনায় পূর্ণ হয়ে যায় এবং সকল আবরণকে বিদীর্ণ করে ফেলে, সেই সময় বুঝে যাওয়া উচিত যে দোয়া কবুল হয়েছে। এটি মহান নাম। **(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১০০)**

দোয়াপ্রার্থী: **Pervez Hossain Sb, Bolpur, Birbhum**

প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াতে বলেন, অর্থাৎ; যখন তুমি এক মুষ্টি পাথর নিক্ষেপ করেছ তখন তুমি তা নিক্ষেপ করো নি বরং আল্লাহ্ নিক্ষেপ করেছেন। অর্থাৎ পর্দার অন্ত রালে ঐশী শক্তি কার্যকর ছিল, মানবীয় শক্তির জন্য তা সম্ভব ছিল না।"

(আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৬৫)

যাহোক কিছুক্ষণ পর মুশরিকদের মধ্যে ব্যর্থতা ও উদ্বেগের লক্ষণ স্পষ্ট হয়। মুসলমানদের প্রচণ্ড আক্রমণে তাদের সারিগুলো ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। তাদের মাঝে আতঙ্ক দেখা দেয়। মুসলমানরা তাদের ধাওয়া করে পরাজিত করে।

কাফিরদের বিরুদ্ধে হযরত সা'দ (রা.)'র তীব্র ভাবাবেগ সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, শত্রুরা যখন পরাজিত হয়ে অস্ত্র সমর্পণ করে আর সাহাবীরা তাদের বন্দি করতে শুরু করে, তখন মহানবী (সা.) হযরত সা'দ (রা.)'র চেহারায় অপছন্দের ছাপ দেখতে পান। অর্থাৎ মুসলমানদের এই কাজকে তিনি অপছন্দের দৃষ্টিতে দেখছিলেন। তখন মহানবী (সা.) হযরত সা'দ (রা.)-কে বলেন, হে সা'দ! মনে হচ্ছে তুমি মানুষের এই কাজ, অর্থাৎ মুশরিকদের আটক করাকে অপছন্দ করছ। তিনি (রা.) বলেন, আপনি ঠিক বলেছেন হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! মুশরিকদের সাথে এটাই আমাদের প্রথম ও সফল যুদ্ধ, তাই আমার মতে মুশরিকদের বাঁচিয়ে রাখার চেয়ে যত বেশি সম্ভব হত্যা করাই শ্রেয়।

(আসসীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৩০)

তিনি (রা.) বলেন, আমি বন্দি করা অপছন্দ করছি, আমি চাই তাদের সবাইকে যেন হত্যা করা হয়।

বদরের যুদ্ধে ফিরিশ্তাদের অবতরণ সম্পর্কে লেখা আছে, আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে বলেছেন, إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ (সূরা আনফাল: ১০)। অর্থাৎ যখন তোমরা তোমাদের রবের সমীপে ফরিয়াদ করেছিলে তখন তিনি এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে তোমার দোয়া কবুল করেছিলেন যে, আমি অবশ্যই সারিবদ্ধ এক হাজার ফিরিশ্তা দিয়ে তোমাকে সাহায্য করব।

হযরত মুহাম্মদ (সা.)ও বদরের যুদ্ধে ফিরিশ্তাদের অবতরণের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। বদরের যুদ্ধের দিন মহানবী (সা.) বলেন, ইনি হলেন জিব্রাঈল, তিনি তাঁর ঘোড়ার লাগাম ধরে রেখেছেন এবং সমরাস্ত্রে সুসজ্জিত আছেন। সীরাত ইবনে হিশামের বেশ কয়েকজন সাহাবীর রেওয়ায়েত বদরের দিন ফিরিশ্ তার অবতরণের বিষয়টি প্রমাণ করে।

[দায়েরায়ে মারেফ, সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ২১৪]

সাহাবীদের সম্পর্কে তার অনেকগুলো রেওয়ায়েত আছে। হযরত জিব্রাঈল (আ.) মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে বলেন, মুসলমানদের মধ্যে যারা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন তাদেরকে আপনি কী মর্যাদা দেন? তিনি (সা.) বলেন, সেরা মুসলিম অথবা এমনই অন্য কোনো কথা বলেছেন। তখন জিব্রাঈল বলেন, একইভাবে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ফিরিশ্তারাও উত্তম।

(সহীহ্ আল বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস-৩৯৯২)

একজন জীবনীকার এ রেওয়ায়েতও লিখেছেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, বনু গাফ্ফারের এক ব্যক্তি আমার কাছে বলেছে, আমি এবং আমার এক চাচাতো ভাই এসে এমন একটি পাহাড়ে উঠলাম যেখান থেকে বদরের (যুদ্ধের) দৃশ্য দেখা যাচ্ছিল। আমরা মূর্তিপূজারী ছিলাম এবং যুদ্ধে কারা বিপর্যয়ের শিকার হয় তা (দেখার জন্য) অপেক্ষমান ছিলাম যাতে লুটপাটকারীদের সাথে আমরাও লুণ্ঠনে অংশ নিতে পারি। অতএব আমরা পাহাড়ে থাকা অবস্থায়ই এক টুকরো মেঘ আমাদের কাছে এলে আমরা তাতে ঘোড়ার হ্রেষা শুনতে পাই। আমি এক ব্যক্তিকে একথা বলতে শুনেছি যে, হ্যাযম! (অর্থাৎ) এগিয়ে যাও। এ আওয়াজ শুনে আমার চাচাতো ভাইয়ের হৃদপিণ্ডের পর্দা ফেটে যায় আর সে ঘটনাস্থলেই মারা যায়। বাকি রইলাম আমি আর আমিও মৃত্যুর দ্বার প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিলাম কিন্তু পরে আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করি।

(সীরাত ইবনে হিশাম, পৃ: ৪৩১)

সুহায়েল বিন আমর তখন কাফির ছিলেন, তিনি বলেন, বদরের দিন আমি রংবেরঙের ঘোড়ায় আরোহিত শুভ্রপোশাকধারী লোকদের দেখেছি। তারা ছিল আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে দণ্ডায়মান আর তারা কুরাইশদের হত্যা করছিল ও বন্দি করছিল। মূল কথা হলো, বদরের দিন শুধু মুসলমানরাই ফিরিশ্তা দেখে নি বরং কাফিররাও দেখেছে।

[দায়েরায়ে মারেফ, সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ২১৫]

যুগ ইমামের বাণী

ইসলামের সুরক্ষা এবং সত্যের উদ্ঘাটনের জন্য সর্বপ্রথম তোমরা প্রকৃত মুসলমানের নমুনা হয়ে দেখাও।

(মালফুযাত , ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৫)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

আবু উসায়েদ মালিক বিন রবীয়্যা (রা.) বদরের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন, তার একটি রেওয়ায়েত আছে। এ ঘটনাটি তার দৃষ্টিশক্তি হারানোর পরের ঘটনা। তিনি ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেন যে, আমি যদি আজ বদরের প্রান্তরে থাকতাম এবং আমার দৃষ্টিশক্তি থাকত তাহলে আমি তোমাদের সেই উপত্যকাটিও দেখাতাম (তিনি যখন ঘটনা বর্ণনা করছিলেন তখন তার দৃষ্টিশক্তি ছিল না) যেখান থেকে ফিরিশ্তা বের হয়েছে। আমার এতে কোনো সন্দেহ বা সংশয় নেই। আবু দাউদ মা'যানীর রেওয়ায়েত রয়েছে, তিনি বদরের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, নিঃসন্দেহে আমি বদরের দিন এক মুশরিকের পিছু ধাওয়া করি তার ওপর আঘাত হানার জন্য। হঠাৎ আমি দেখি, আমার তরবারি তাকে স্পর্শ করার পূর্বেই তার মস্তক কাটা পড়ে। তখন আমি বু ঝতে পারি, তাকে আমি নই বরং অন্য কেউ হত্যা করেছে। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা.)'র পক্ষ থেকে রেওয়ায়েত রয়েছে যে, বদরের দিন ফিরিশ্তাদের চিহ্ন ছিল শুভ্র পাগড়ি, সেগুলো শিমলা (অর্থাৎ পাগড়ির পেছন দিকের লম্বা কাপড়) পিঠের ওপর ঝুলিয়ে রেখেছিল এবং হুনায়নের দিন লাল পাগড়ি তাদের চিহ্ন ছিল। হযরত আলী (রা.)'র পক্ষ থেকে রেওয়ায়েত হলো, পাগড়ি আরবদের মুকুটস্ব রূপ আর বদরের দিন ফিরিশ্তাদের চিহ্ন ছিল সাদা পাগড়ি যার (পেছনের কাপড়) তারা পিঠের ওপর ঝুলিয়ে রেখেছিল, কিন্তু হযরত জীব্রাঈল (আ.)'র মাথায় হলুদ পাগড়ি ছিল।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)'র রেওয়ায়েত হলো, ফিরিশ্তারা বদরের যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোনো যুদ্ধে লড়াই করে নি। অন্যান্য যুদ্ধে তারা সংখ্যা বৃদ্ধি ও সমর্থন জোগানোর উদ্দেশ্যে অংশগ্রহণ করত, কিন্তু কাউকে আঘাত করত না। এটি সীরাত ইবনে হিশামের রেওয়ায়েত। (সীরাত ইবনে হিশাম, পৃ: ৪৩১-৪৩২)

কিছু লোকের ধারণা হলো, ফিরিশ্তার অবতরণ কেবল মু 'মিনদের জন্য সুসংবাদস্বরূপ এবং তাদের হৃদয়ের প্রশান্তির জন্য ছিল অন্যথায় ফিরিশ্ তারা কার্যত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নি। এই দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন সহীহ্ হাদীস পরিপন্থী। সহীহ্ রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণিত যে, ফিরিশ্তারা কার্যত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। অবশ্য এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, সাহায্যের জন্য তো একজন ফিরিশ্তাই যথেষ্ট ছিল, তাহলে হাজার হাজার ফিরিশ্তা কেন অবতীর্ণ হলো?

যুদ্ধের সময় ফিরিশ্তার অবতরণ সম্পর্কে সহীহাঈনে বিদ্যমান বিভিন্ন হাদীস উদ্ধৃত করে ইমাম ইবনে কাসীর লিখেন, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ফিরিশ্তার অবতরণ এবং এ সম্পর্কে মুসলমানদের অবগত করা সুসংবাদস্বরূপ ছিল অন্যথায় এছাড়াও আল্লাহ্ তা'লা তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের সাহায্য করতে পারেন। এজন্য তিনি বলেন, সাহায্য কেবল আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই আসে এবং সূরা মুহাম্মদে তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ চাইলে নিজেই কাফেরদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে পারেন, কিন্তু তিনি পরীক্ষা করেন।

[দায়েরায়ে মারেফ, সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ২১৮-২১৯]

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, বদরের যুদ্ধে খোদা তা'লা মেঘমালা থেকে স্বীয় চেহারা প্রকাশ করেন, অর্থাৎ যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বেই বৃষ্টি হয় যার ফলে কাফিরদের চরম ক্ষতি হয় এবং যুদ্ধের দৃষ্টিকোণ থেকে মু'মিনদের বিশাল উপকার হয়। আবার মু'মিনদের সাহায্য এবং কাফিরদের মাঝে ভীতি সঞ্চারের জন্য ফিরিশ্তারাও হৃদয়ে অবতরণ করেছে বরং বদরের যুদ্ধে বেশ কয়েকজন কাফির স্ব চক্ষে ফিরিশ্তাদের দেখেছে এবং কুযিয়াল আমরু(অর্থাৎ বিষয়ের নিষ্পত্তি হয়েছে) আয়াত অনুযায়ী আরবের নেতাদেরকে বেছে বেছে হত্যা করা হয়েছে। " (তফসীর কবীর, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৫৮)

অনুরূপভাবে তফসীরে সগীরে, সূরা আলে ইমরানের ১২৭ নম্বর আয়াতের তফসীরি নোটে লেখা আছে, ফিরিশ্তাদের কথা উল্লেখ করার একমাত্র কারণ হলো, স্বপ্ন বা দিব্যদর্শনে সুসংবাদ লাভের ফলে মানুষের মনোবল বৃদ্ধি পায় নতুবা এর প্রকৃত অর্থ হলো, খোদা তা'লা সাহায্য করবেন।"

(তফসীর সাগীর, পৃ: ৯৬, সূরা আলে ইমরান, আয়াত-১২৭ এর ব্যাখ্যায়)

যাহোক, এটি একটি দিব্যদর্শনও হতে পারে বা বাস্তব চিত্রও হতে পারে যা মুসলমানরা এবং কাফিররা উভয়েই দেখেছে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর পুস্ত ক 'আত্ তবলীগ' তথা আয়েনায়ে কামালাতেইসলামে আরবীতে উল্লেখ করেছেন। আরবী বিভাগের কর্মীরা বলে, অনেক সময় আপনি দীর্ঘ উদ্ধৃতি পাঠ করেন তখন আমাদের জন্য অনুবাদ করা কঠিন হয়ে যায় তাই আমি মূল আরবীও পড়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

যুগ ইমামের বাণী

যাঁর আশিস ও কল্যাণের ধারা সদা প্রবাহমান, তিনিই হলেন জীবিত নবী। (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬২৯)

দোয়াপ্রার্থী: Qazi Abdur Rashid, Basantapur, 24 PGS (S)

ছিলেন। শাহাদত বরণকারী মুহাজির সাহাবীরা হলেন ১. হযরত উবায়দা বিন হারেস বিন মুত্তালিব (রা.), ২.হযরত উমায়ের বিন আবী ওয়াক্কাস (রা.), ৩. যুশ-শিমালাইন অর্থাৎ হযরত উমায়ের বিন আমর ও ৪. হযরত আকেল বিন বু কায়ের (রা.), ৫. হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)'র মুক্ত ক্রীতদাস মেহযা এবং ৬. হযরত সাফওয়ান বিন বায়যা (রা.)। আর আনসাররা হলেন- ৭.হযরত সা'দ বিন খায়সামা (রা.), ৮. হযরত মুবাশ্বের বিন আব্দুল মুনযির (রা.), ৯. হযরত ইয়াযীদ বিন হারেস (রা.), ১০. হযরত উমায়ের বিন হুমাম (রা.), ১১. হযরত রাফে' বিন মুআল্লা (রা.), ১২. হযরত হারেসা বিন সুরাকা (রা.)।

মুশরিকদের মোট সত্তরজন মারা গিয়েছিল, যাদের বেশিরভাগই কুরাইশ-নেতা ছিল। কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ও নিহত নামিদামি ব্যক্তির নাম হলো, হানযালা বিন আবু সুফিয়ান, হারেস বিন হাযরামি, আহমার বিন হাযরামি, উবায়েদ বিন সাঈদ বিন আস, আস বিন সাঈদ বিন আস, উকবা বিন আবি মুআয়েত, উতবা বিন রবীয়্যা, শায়বা বিন রবীয়্যা, ওয়ালীদ বিন উতবা বিন রবীয়্যা, হারেস বিন আমের আবুল বাখতারী, আস বিন হিশাম, নাযার বিন হারেস, আবুল আস বিন কায়েস, উমাইয়্যা বিন আস বিন হিশাম-এর নাম দু'বার এসেছে না-কি দু 'জন পৃথক ব্যক্তি। আবুল আস বিন কায়েস, উমাইয়া বিন খালাফ, আবু জাহল যার নাম আমর বিন হিশাম ছিল। তাদের অধিকাংশই মক্কায় মুসলমানসহ মহানবী (সা.)-কে কষ্ট দিত।
(সীরাত ইবনে হিশাম, পৃ: ৪৭৬-৪৮০) (কিতাবুল মাগাযি লিল ওয়াকদি, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৪৫)

এ বিষয়ের অবশিষ্টাংশ আগামীতে বর্ণনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ্।

কিছু দোয়ার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই।

ফিলিস্তিনের মুসলমানদের জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের জন্য সহজসাধ্যতা সৃষ্টি করুন। নির্যাতিতদের সাহায্য করুন। তাদেরকে এমন নেতৃত্ব কিংবা পথপ্রদর্শক দান করুন যারা তাদের অধিকার আদায় করবে, তাদেরকে সঠিক পথ দেখাবে এবং তাদেরকে অত্যাচারের কবল থেকে পরিত্রাণ দেওয়ার চেষ্টা করবে। বর্তমানে তারা চরম নির্যাতিত এবং মনে হয় তাদের দেখাশোনার কেউ নেই। তাদের পথ দেখানোর কেউ নেই।

মুসলমানরা যদি এক হয়ে যায় তবে এই সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে।

একইভাবে সুইডেনে এবং অন্য কিছু দেশেও বাক স্বাধীনতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতার নামে দুষ্কর্মকারীরা অবাধ স্বাধীনতা পেয়েছে আর তারা এই অজুহাতে মুসলমানদের আবেগ-অনুভূতি নিয়ে খেলে, প্রতিদিন এমন কোনো না কোনো আচরণ করে যা মুসলমানদের অনুভূতিতে আঘাত হানে। অত্যন্ত নোংরা আচরণ করে থাকে- পবিত্র কুরআনের অবমাননা করে কিংবা মহানবী (সা.) সম্পর্কে অশালীন ভাষা প্রয়োগ করে। আল্লাহ্ তা'লা-ই তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করুন। এক্ষেত্রেও মুসলমান রাষ্ট্রসমূহের দোষ রয়েছে, যাদের বিভেদের কারণে ইসলামবিরোধী শক্তিসমূহ এ ধরনের অন্যায় আচরণ করে থাকে। মুসলমানদের পক্ষ থেকে কোনো প্রতিক্রিয়া যদি ব্যক্ত হয় তবে তাও সাময়িক হবে এবং এমন আচরণ করবে যার কোনো প্রভাব থাকবে না। অতএব মুসলমান নেতাদের এবং উম্মতের জন্য অনেক দোয়া করুন। এর অনেক বেশি প্রয়োজন।

ফ্রান্সে যে পরিস্থিতি বিরাজমান সেখানেও মুসলমানদেরকে আক্রমণের লক্ষ্যে পরিণত করা হচ্ছে আর এর বিপরীতে মুসলমানদের কিংবা অন্যদের সাথে মিলিত হয়ে যে প্রতিক্রিয়া দেখানো হচ্ছে তাও ভুল। ভাঙচুর করে কোন লাভ নেই। মুসলমানদের নিজেদের আমল ইসলামী শিক্ষাসম্মত করতে হবে। মুসলমানদের কথা ও কাজ যখন ইসলামী শিক্ষানুযায়ী হবে তখনই সফলতা লাভ হবে। যাইহোক, আমরা তো কেবল দোয়া-ই করতে পারি।

বিশেষত, মুসলমান-বিশ্বে র জন্য এবং সামগ্রিকভাবে সমগ্র-বিশ্বে র জন্য দোয়া করুন যেন আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে অত্যাচার নিপীড়ন থেকে সুরক্ষিত রাখেন আর পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তাপূর্ণ পরিবেশও সৃষ্টি হয়। সবাই যেন একে অপরের অধিকার প্রদান করার গুরুত্ব অনুধাবন করতে সক্ষম হয়, নতুবা বিশ্ব যেদিকে এগুচ্ছে, আমি বহুবার বলেছি যে, বিরাট ধ্বংসয জ্ঞের দিকে ধাবিত হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা রহম করুন।

একইভাবে পাকিস্তানের আহমদীদের জন্যও অনেক দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে সকল অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন। ফ্রান্সে বাহ্যত অনেক বিক্ষোভ প্রদর্শিত হচ্ছে এবং মনে করা হচ্ছে, যে ছেলেটিকে হত্যা করা হয়েছে তার পক্ষে অনেক কাজ হচ্ছে কিন্তু বাস্তবিক অর্থে সেখানকার জনসাধারণের আচরণ ভিন্ন। শুনেছি তারা দু'জনের জন্যই তহবিল সংগ্রহ করেছে । অর্থাৎ সেই পুলিশের জন্যও যাকে ধরা হয়েছে এবং সেই ছেলের জন্যও যাকে হত্যা করা হয়েছে। ছেলেটির জন্য সংগ্রীহিত হয়েছে মাত্র দুই লাখ ইউরো এবং পুলিশের জন্য এক মিলিয়নের অধিক অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছে যার সম্পর্কে বলা হচ্ছে, আমরা তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করব। সরকারও তার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করছে এবং তাকে সাহায্য করছে।

আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করুন, সেসব লোককে ন্যায়ের পথে চলার সামর্থ্য দিন এবং মুসলমানদের একজোট হওয়ার তৌফিক দান করুন।

****

":وَ قَدْ جَرَتْ عَادَتُهٗ وَ سُنَّتُهٗ اَنَّهٗ يَخْتَارُ الْاِخْفَاءَ وَالْكِتْمَ فِيْ وَاقِعَاتٍ قَضَتْ حِكْمَتُهٗ اِخْفَاءَ هَا وَ يَخْلُقُ الْاَهْوَاءَ فَتَحْشُرُ الْاٰرَاءُ اِلٰى جِهَاتٍ اُخَرٰى. وَاِذَا اَرَادَ اِخْفَاءَ صُوْرَةِ نَفْسٍ وَاقِعَةٍ فَرُبَّمَا يَرٰى فِيْ تِلْكَ الْمَوَاضِعِ الْوَاقِعَةَ الْكَبِيْرَةَ صَغِيْرَةً مَهُوْنَةً ، وَالْوَاقِعَةَ الصَّغِيْرَةَ الْمَسْنُوْنَةَ كَبِيْرَةً نَادِرَةً وَالْوَاقِعَةَ الْمُبَشَّرَةَ مُخَوَّفَةً وَالْوَاقِعَةَ الْمُخَوَّفَةَ مُبَشَّرَةً. فَهٰذِهٖ اَرْبَعَةُ اَقْسَامٍ مِنَ الْوَاقِعَاتِ مِنْ سُنَنِ اللّٰهِ كَمَا مَضٰى. اَمَّا الْوَاقِعَةُ الْكَبِيْرَةُ الْعَظِيْمَةُ الَّتِيْ اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يُّرِيَهَا صَغِيْرَةً حَقِيْرَةً فَنَظِيْرُهَا فِي الْقُرْاٰنِ وَاقِعَةُ بَدْرٍ لِمَنْ يَتَدَبَّرُ وَ يَرٰى. فَاِنَّ اللّٰهَ قَلَّلَ اَعْدَاءَ الْاِسْلَامِ بِبَدْرٍ فِيْ مَنَامِ رَسُوْلِهٖ لِيُذْهِبَ الرَّوْعَ عَنْ قُلُوْبِ الْمُسْلِمِيْنَ وَ يَقْضِيَ مَا اَرَادَ مِنَ الْقَضَاءِ. وَ اَمَّا الْوَاقِعَةُ الَّتِيْ اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يُّرِيَهَا كَبِيْرَةً نَادِرَةً فَنَظِيْرُهَا فِي الْقُرْاٰنِ بِشَارَةُ مَدَدِ الْمَلَائِكَةِ كَيْ تَقَرَّ قُلُوْبُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ لَا تَأْخُذَهُمْ خِيْفَةٌ فِيْ ذَالِكَ الْمَأْوٰى. فَاِنَّهٗ تَعَالٰى وَعَدَ فِي الْقُرْاٰنِ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَبَشَّرَهُمْ بِاَنَّهٗ يُمِدُّهُمْ بِخَمْسَةِ اٰلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَ مَا جَعَلَ هٰذَا الْعَدَدَ الْكَثِيْرَ اِلَّا لَهُمْ بُشْرٰى. لِاَنَّ فَرْدًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ يَقْدِرُ بِاِذْنِ رَبِّهٖ عَلٰى اَنْ يَّجْعَلَ عَالِيَ الْاَرْضِ سَافِلَهَا فَمَا كَانَ حَاجَةٌ اِلٰى خَمْسَةِ اٰلَافٍ بَلْ اِلٰى خَمْسَةٍ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ شَاءَ اَنْ يُّرِيَهُمْ نُصْرَةً عَظِيْمَةً فَاخْتَارَ لَفْظًا يَفْهَمُ مِنْ ظَاهِرِهٖ كَثْرَةُ الْمُمِدِّيْنَ وَ اَرَادَ مَا اَرَادَ مِنَ الْمَعْنٰى. ثُمَّ نَبَّهَ الْمُؤْمِنِيْنَ بَعْدَ فَتْحِ بَدْرٍ اَنَّ عِدَّةَ الْمَلَائِكَةِ مَا كَانَتْ مَحْمُوْلَةً عَلٰى ظَاهِرِ اَلْفَاظِهَا بَلْ كَانَتْ مُؤَوَّلَةً بِتَأْوِيْلٍ يَعْلَمُهُ اللّٰهُ بِعِلْمِهِ الْاَرْفَعِ وَالْاَعْلٰى. وَ فَعَلَ كَذَالِكَ لِتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُهُمْ بِهٰذِهِ الْبُشْرٰى وَيَزِيْدَهُمْ حُسْنَ الظَّنِّ وَالرَّجَاءِ"

(التبلیغ، روحانی خزائن، جلد 5، صفحہ 447 تا 449)

এর অনুবাদ হলো, তাঁর এই রীতি ও সুন্নত আদীকাল হতে জারী আছে যে, তিনি সেসব ঘটনাকে সুপ্ত ও লুক্কায়িত রাখেন যেখানে প্র জ্ঞার দাবি হলো তা গোপন রাখা। মানুষের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা এবং মতামত প্রকৃত সত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে থাকে। কখানো কখনোবড় ঘটনাকে ছোট এবং সাধারণ ঘটনা হিসাবে তুলে ধরে এবং ছোট ঘটনাকে বড় ও বিরল ঘটনা হিসাবে বর্ণনা করে। একইভাবে সুসংবাদবাহী ঘটনাকে সতর্কবাণী এবং সতর্কবাণীকেসুসংবাদবাহী ঘটনা হিসাবে দেখিয়ে থাকে। এসব হলো ঘটনাবলীর চারটি ধরণ বা প্রকারভেদযা আল্লাহ্র সুন্নত বা রীতি অনুসারে চলছে ও প্র বর্তিত আছে। সেই মহান ও বড় ঘটনা যেটিকে আল্লাহ্ ছোট ও তুচ্ছ ঘটনা আকারে প্রদর্শন করেছেন সেটি হলো বদরের ঘটনা, তার জন্য যে প্রণিধান ও অভিনিবেশ করে দেখতে চায়। অতএব আল্লাহ্ বদরের যুদ্ধের সময় তাঁর রসূল (সা.)-এর স্বপ্নে ইসলামের শত্রু সংখ্যা কম করে দেখিয়েছেন যেন মুসলমানদের মন থেকে শত্রুভীতি দূর হয় আর আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন তা যেন অবশ্যই পূর্ণ হয়। আর সেই ঘটনা যেটিকে আল্লাহ্ বড় ও বিরল হিসাবে দেখাতে চেয়েছেন এর দৃষ্টান্ত পবিত্র কুরআনে বিদ্যমান আর তা হলো, ফিরিশ্তাদ্বারা সাহায্য প্রদানের সুসংবাদ; যেন মু'মিনদের হৃদয় প্রশান্ত হয় এবং যুদ্ধক্ষেত্রে যেন কোনোরূপ ভয় না থাকে। অতএব আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে মু'মিনদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং সুসংবাদ দিয়েছেন যে, পাঁচ হাজার ফিরিশ্ তাদ্বারা তাদের সাহায্যের জন্য আসবে। এই সংখ্যাকে বেশি করে দেখিয়েছেন যেন তাদের জন্য সুসংবাদের কারণ হয়, যদিও ফিরিশ্তাদের মধ্যে একজন ফিরিশ্তাই আপন প্রভুর নির্দেশে পৃথিবী ওলটপালট করে দিতে পারে। এজন্য পাঁচ হাজার তো নয়ই বরং পাঁচ জনেরও প্রয়োজন নেই কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা মহান সাহায্য প্রদর্শন করতে চেয়েছেন, তাই তিনি এমন শব্দ বেছে নেন যা দ্বারা সাহায্যকারীদের আধিক্য প্রকাশ পায় এবং এটিই বুঝাতে চেয়েছিলেন। তিনি বদরের বিজয়ের পর মু'মিনদের এ সংবাদ প্রদান করেন, ফিরিশ্তাদের সংখ্যা বাহ্যিক শব্দকেন্দ্রিক ছিল না বরং এর ব্যাখ্যা কেবল মহান আল্লাহ্ তা'লাই সর্বাপেক্ষা ভালো জানেন। আল্লাহ্ তা'লা এমনটি এজন্য করেন যাতে এ সুসংবাদের মাধ্যমে তাদের হৃদয় প্রশান্ত হয় এবং তারা সুধারণা ও আশায় বুক বাঁধতে পারে।

মুশরিকদের পরাজয় বরণ সম্পর্কে লেখা আছে, কিছুক্ষণ পর সর্বমুখী যুদ্ধ আরম্ভ হলেমুশরিক বাহিনীতে ব্যর্থতা ও অস্থিরতার লক্ষণ প্রকাশ পেয়ে যায়। মুসলমানদের প্রবলআক্রমণের সামনে তাদের সারি ছত্রভঙ্গ হতে শুরু করে। যুদ্ধের ফলাফল খুব দূরে ছিল নাযেমনটি পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে। মুশরিকদের বাহিনী বিশৃংখলভাবে পিছু হটে এবং তারা পালাতে থাকে। মুসলমানরা মারকাট এবং ধরপাকড়ের মাধ্যমে তাদের পিছুধাওয়া করে। এক পর্যাযে তারা চরমভাবে পরাজিত হয়। (আর রাহীকুল মাখতুম, পৃ: ২৯৯)

অতঃপর একস্থানে লেখা আছে, এই যুদ্ধ মুশরিকদের শোচনীয় পরাজয় এবং মুসলমানদের প্রকাশ্য বিজয়ে পর্যবসিত হয়। এতে চৌদ্দজন মুসলমান শহীদ হন- ছয়জন ছিল মুহাজিরদের মধ্য থেকে এবং আটজন আনসারের মধ্য থেকে। পক্ষান্ত রে মুশরিকদের ভীষণ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। তাদের সত্তরজন মারা যায় এবং সত্তরজনকে বন্দি করা হয় যাদের অধিকাংশই নেতা, সর্দার এবং বড় বড় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব ছিল। (আর রাহীকুল মাখতুম, পৃ: ৩০৬)

যেমনটি বলা হয়েছে, বদরের যুদ্ধে মোট চৌদ্দজন মুসলমান শাহাদত বরণ করেছেন। তাদের মধ্যে ছয়জন মুহাজির এবং আটজন আনসারের মধ্য থেকে

মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া যুক্তরাজ্যের ইজতেমায় হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ

জামা'তের বিশ্ব প্রধান, খলিফাতুল মসীহ আল খামেস, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.), যুক্তরাজ্য মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার (আহমদীয়া মুসলিম যুব সংঘের) তিন দিনব্যাপী জাতীয় ইজতেমার সমাপনীতে এক ঈমানোদ্দীপক ভাষণ প্রদান করেন।

তৃতীয়বারের মতো কিংসলির কাস্ট্রি মার্কেটে অনুষ্ঠিত ইজতেমার উদ্দেশ্যসমূহ ছিল মুসলিম যুবকদের ইসলামের প্রকৃত শান্তিপূর্ণ শিক্ষা সম্পর্কে প্রশিক্ষিত করাএবং তাদেরকে তাদের ধর্ম এবং দেশের সেবায় যথাসাধ্য নিবেদিত হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করা।

এ বছরের ইজতেমার ভাবমূল ছিল 'খোদাতা'লার অস্তিত্ব'। সমাপনী ভাষণে হুযুর আনোয়ার (আই.) বিস্তারিতভাবে নিজেদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক অবস্থার প্রতি মনোযোগী হওয়ার গুরুত্বের বিষয় আলোচনা করেন।ইজতেমার ন্যায় ধর্মীয় সমাবেশের প্রকৃত উদ্দেশ্যের উপর আলোকপাত করতে গিয়ে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আমাদের জলসা এবং ইজতেমাসমূহ আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য এই যে, সকল অংশগ্রহণকারী যেন সমবেত হয়ে নিজেদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মানকে উন্নত করতে পারেন এবং তাদের ধর্মীয়জ্ঞান বৃদ্ধি করতে পারেন এবং অনুধাবন করতে পারেন যে তাদের সর্বদা নিজেদের উন্নয়নে সচেষ্ট থাকা উচিত।"

হুযুর আনোয়ার (আই.) আরো বলেন:

"সবচেয়েগুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, ইজতেমা অংশগ্রহণের ফলে সকল অংশগ্রহণকারীদের মনোযোগ আল্লাহ্ নৈতিক অবস্থার সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। যদি প্রত্যেক খাদেম (যুবক সদস্য) এ বিষয়ে মনোযোগী হয় তবে এটি তাকে খোদা তা'লার আদেশাবলী পালন করার এবং অনৈতিকতা ও পাপ থেকে বাঁচার তৌফিক দান করবে।"

হুযুর আনোয়ার জোর দেন যে, বৃহত্তর পরিসরে বিশ্বের সংশোধনের প্রয়াসের পূর্বে ব্যক্তিগত সংশোধন অত্যাবশ্যক, নতুবা মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার স্লোগানটি "সমাজের কল্যাণ সাধনের এর পরিবর্তে বৃথা ও অর্থহীন শব্দে পরিপূর্ণ একটি কৃত্রিম মন্ত্রে" পরিণত হবে।

হুযুর আনোয়ার আলোচনা করেন কিভাবে মানুষ বড় সংখ্যায় ধর্মকে পরিত্যাগ করছে, এবং সাধারণভাবে, আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বে অবিশ্বাসকে বরণ করে নিচ্ছে।

যারা আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে তাদের প্রশ্ন ও যুক্তিসমূহের উত্তর প্রদানে হুযুর আনোয়ার আহমদী মুসলিম যুবকদেরকে যে ভূমিকা রাখতে হবে তার গুরুত্ব তুলে ধরেন।

"প্রত্যেক আহমদী মুসলিমকে সন্দেহ পোষণকারী এবং সংশয় প্রকাশকারীদের নিকট প্রমাণ করে দিতে হবে যে খোদা তা'লা বিদ্যমান এবং তিনি এক জীবন্ত খোদা এবং ইসলাম তাঁর নিকট হতে অবতীর্ণ চূড়ান্ত ধর্ম।"

হুযুর আনোয়ার (আই.) আরো বলেন:

"এ প্রয়াসে আপনাদের ভূমিকাকে খাটো করে দেখবেন না বা এই বাণী পৌঁছানোকে অন্যদের কাজ মনে করবেন না। নিশ্চিতভাবে, আহমদী মুসলিম যুব সমাজকে এ প্রয়াসে নেতৃত্ব দিতে হবে এবং আমাদের সময়ের এই মহান চ্যালেঞ্জকে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে হবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) অংশগ্রহণকারীদের জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ মহানবী (সা.) এর সাহাবাদের আত্মত্যাগ এবং আধ্যাত্মিকতার মান তুলে ধরেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) (আই.) বলেন:

"মহানবী (সা.) এর সাহাবাগণ সেসই সম্মানিত জনগোষ্ঠী যাদের সম্পর্কে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে তাঁরা কেবল তাদের ধর্মকে সমুদয়পার্থিব বিষয়াদির উপর প্রাধান্য দেওয়ার অঙ্গীকারই করেন নি, বরং আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, তাঁরা সেই অঙ্গীকারকে সর্বাধিক বিস্ময়করভাবে তাঁরা তাদের অঙ্গীকার পূরণে কোন সুযোগ অপূর্ণ রাখেন নি এবং ধর্মের খাতিরে সর্বপ্রকার কুরবানী প্রদান করেছেন।"

হুযুর আনোয়ার (আই.) আরো বলেন:

"এর ফলস্বরূপ, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে আধ্যাত্মিক ও নৈতিকভাবে অসাধারণ উন্নতির তৌফিক দান করেছেন। একই সাথে, তিনি তাদেরকে জাগতিক ক্ষেত্রেও কল্যাণমণ্ডিত করেছেন। এমনভাবে যে, তাদের কেউ কেউ আজকের পরিভাষায় 'কোটিপতি'তে পরিণত হয়েছে। কিন্তু, সেই সম্পদ কখন তাদেরকে তাদের ধর্ম থেকে দূরে নিয়ে যায় নি বা তাদেরকে পদস্খলিত করে নি।"

'ইস্তেগফার'-এর দর্শন ব্যাখ্যা করে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"আল্লাহ্ তা'লার কাছে কেবল অতীত ভুলত্রুটি ও পাপ সমূহের জন্য ক্ষমা চাওয়া ইস্তেগফারের পদ্ধতি না। কেবল অতীতের দিকে নয় বরং ভবিষ্যতের দিকেও তাকানো উচিত। সুতরাং আপনাদের পূর্বের ভুলত্রুটির জন্য ক্ষমা চাওয়ার সময় ভবিষ্যতে এমন পাপ সমূহ থেকে দূরে থাকার জন্যও আপনাদেরকে অত্যন্ত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে হবে।"

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, ক্ষমা চাওয়ার পাশাপাশি কুরআনের ভাষায় 'আমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করো' এ দোয়ার মাধ্যমে খোদাতালার সাহায্য চাওয়া উচিত।

এ বিষয়টি আরো ব্যাখ্যা করে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: "এ দোয়া পরিপূর্ণ বিনয়ের সাথে এবং তাকওয়ার পথে থাকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সাথে করা উচিত।"হুযুর আনোয়ার (আই.) "অতএব প্রত্যেক আহমদী মুসলিমের - পুরুষ বা নারী, তরুণ বা বৃদ্ধ - মসীহ মাওউদ (আ.)-এর উপর ঈমান আনার পর এবং ধর্মকে সমুদয় পার্থিব বিষয়াদির উপর প্রাধান্য দানের অঙ্গীকার করার পর, বারবার এ দোয়া করা উচিত যেন সঠিক হেদায়াতের পথে থাকতে পারেন।"

ধর্মকে সমুদয় পার্থিব বিষয়াদির উপর প্রাধান্য দেওয়া প্রসঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)উপস্থিত দর্শক শ্রোতাদের আজকের সমাজে বিদ্যমান বহুমুখী বিপদাবলী সম্পর্কে সতর্ক করেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"এটি মোটেই অত্যুক্তি হবে না যদি বলা হয় যে, এ যুগে পূর্বের যে কোন সময়ের তুলনায় সমাজ শয়তানী প্রভাবসমূহের দ্বারা প্লাবিত হয়ে আছে। তদুপরি, পর্নোগ্রাফি, মাদক, অনলাইন গেমিং, জুয়া, অনৈতিক ও অশোভন সম্পর্ক, নাইটক্লাব গমন এ সকল শয়তানী অনেক প্রভাব রয়েছে যেগুলো কেবলই ক্ষতিকর এবং যেগুলো খোদা তা'লার নিকট হতে মানুষকে দূরে নিয়ে যাচ্ছে।"

হুযুর আনোয়ার (আই.) আরো ব্যাখ্যা করেন যে, কেবলমাত্র খোদা তা'লার দিকে প্রকৃত নিষ্ঠার সাথে ঝুঁকার মাধ্যমেই নাজাত লাভ সম্ভব। তিনি বলেন, এমনকি খোদাতা'লার নবীগণও, তাদের পূতঃ পবিত্র চরিত্র সত্ত্বেও খোদা তা'লার কাছে ক্ষমার জন্য দোয়ারত থেকেছেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"যদি মহান নবীগণেরও মুক্তির জন্য আল্লাহ্‌র দয়া ও অনুগ্রহের প্রয়োজন হয়ে থাকে, তাহলে একজন সাধারণ মানুষ সম্পর্কে কি-ই বা বলা যেতে পারে? নিশ্চয় কেবলমাত্র প্রকৃত নিষ্ঠা ও বিনয়ের সাথে আল্লাহ্‌র দিকে বিনত হওয়া এবং তাঁর ক্ষমা ও অনুগ্রহ যাচনা করার মাধ্যমেই কোন ব্যক্তি সঠিক পথে থাকতে পারে।"

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন- আহমদীয়ার সদস্যদের পরামর্শ দেন তারা যেন সমাজ জুড়ে আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বে বিশ্বাসের প্রচারে নেতৃত্ব গ্রহণ করে।

এ প্রসঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: "(তারা যেন) সত্য সত্যই অনুধাবন করেন যে, তাদেরকে তাদের জাতির সংশোধনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আর এজন্য তাদেরকে সর্বপ্রথম নিজেদের সংশোধন করতে হবে। আপনারা আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সেই সকল সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত হন যারা সারা বিশ্বকে খোদা তা'লার তৌহিদের বিশ্বাসে একতাবদ্ধ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।"

এরপর, হুযুর আনোয়ার এ আকাঙ্খা ব্যক্ত করেন যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের তরুণ সদস্যগণ যেন তাদের ঈমানে দৃঢ় ও ধর্মের প্রতি বিশ্বস্ত থাকেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"এটি আমার একান্ত হৃদয়-নিঙড়ানো দোয়া যে, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার ও আতফালুল আহমদীয়ার সদস্যগণ যেন তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হন যারা তাদের ইসলামী মূল্যবোধকে লালন ও সংরক্ষণ করেন এবং অনুধাবন করেন যে, আহমদী মুসলমান হিসেবে তাদের মূল পরিচয়ের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার উপরই তাদের প্রতিটি সফলতার ভিত্তি রচিত হবে।"

হুযুর আনোয়ার নিম্নোক্ত দোয়ার মাধ্যমে তাঁর ঈমানোদ্দীপক ভাষণ সমাপ্ত করেন:

"আমি দোয়া করি যেন আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের হৃদয়ে যেন মহত্ব ও পবিত্রতা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং আপনারা যেন সর্বোচ্চ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মান বজায় রেখে আপনাদের জীবন যাপন করেন। আপনারা আপনাদের জীবনের প্রতিটি সন্ধিক্ষণে, প্রতিটি ক্ষণে ধারাবাহিকভাবে আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর সৃষ্টির অধিকার আদায়কারী হন। আমীন।"

ইজতেমায় যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের ১৪০টির অধিক স্থানীয় শাখা (কিয়াদাত) থেকে ৬,১০০ এর অধিক আহমদী মুসলিম যুবক অংশগ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন খেলাধুলা ও জ্ঞানগত প্রতিযোগিতায় অংশ নেন, যার মধ্যে প্রেজেন্টেশন প্রতিযোগিতায় সকলকে একাত্ম করার জন্য একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল 'দর্শক ভোট'।

সমবেত মুসলিম যুবকদের জন্য আরো একটি বিশেষ সুযোগ এবার ছিল যেখানে 'দি হাব'-এ গিয়ে বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক বিষয়ে একান্ত পরিবেশে তারা তাদের প্রশ্ন উত্থাপনের সুযোগ পেয়েছেন।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁহযরত (সা.) বলেন- 'আমি আল্লাহ্ তা'লার নিকট 'লাওহে মাহফুয' এ সেই সময় খাতামান্নাবীঈন আখ্যায়িত হয়েছি যখন আদম সৃষ্টির উন্মেষ লগ্নে ছিলেন। (মুসনাদে আহমদ)

দোয়াপ্রার্থী: Shujauddin and Family , Barisha (Kolkata)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"সেই লোকগুলি তোমাদের আদর্শ যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'কোন ব্যবসা, বানিজ্য ও কেনাবেচা তাদেরকে আল্লাহ্‌র যিকর বা স্মরণ থেকে বাধা দেয় না।" *(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১০৪)*

দোয়াপ্রার্থী: Nurjahan Begum, Kolkata (W.B)

মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া ডেনমার্ক এর সদস্যদের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)–এর অনলাইন সাক্ষাত

২০২১ সালের ১৪ই আগস্ট মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া ডেনমার্কের সদস্যরা ভার্চুয়ালভাবে হুযুর (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করেন। তাঁরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে হুযুরকে প্রশ্ন করার সুযোগ পান, যার বিশেষ বিশেষ অংশগুলো উপস্থাপন করা হচ্ছে।

প্রশ্ন: আমার নাম সেলিমুদ্দীন। গত ছয় বছর ধরে ডেনমার্কে বসবাস করছি। এখানকার সমাজব্যবস্থা পাকিস্তানের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। হুযুর! আমরা কিভাবে আমাদের সন্তানদের ডেনিশ সমাজে একীভূত করে উত্তম তরবীয়ত দিতে পারি?

হুযুর আনোয়ার বলেন: অবাক করার বিষয়! ছয় বছরে আপনি এটা বুঝতে পারেন নি? আমি গত ছয় বছরে সেই বিষয়ে অনেক কথা বলেছি। সেগুলো আপনি শুনেছেন?

প্রশ্নকর্তা: জ্বী হুজুর, আমি শোনার চেষ্টা করেছি।

হুযুর আনোয়ার বলেন, সমাজেরর সাথে কিভাবে একীভূত হতে হবে, সে বিষয়ে আমি অনেকবার কথা বলেছি। পিতা-মাতাদের বলেছি যে, সন্তানদের সাথে বন্ধুত্ব করুন যাতে সে বাইরে গিয়ে যা কিছু শিখে, সে যা কিছু আলোচনা করে, যা কিছু তাকে শিখানো হয়, এখানে স্কুলে যেভাবে একদম খোলাখুলিভাবে শিক্ষকরা শেখায়, এই সকল কথা যেন আপনার সাথে সন্তানরা বলে। এজন্য আপনাকে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে হবে। যখন সে আপনার সাথে কথা বলবে,তখন অবশ্যই লজ্জা না পেয়ে তাকে জবাব দিবেন। এমন কিছু প্রশ্ন থাকবে যার উত্তর দিতে পাকিস্তানের সমাজ অনুযায় আপনার লজ্জা লাগতে পারে। এসব বিষয়ে তাকে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে উত্তর দিবেন। কিছু এমন বিষয় আছে যার সম্পর্কে সন্তানদের বলতে হবে যে, তোমাদের হয়তো এই বিষয়ে স্কুলে বলা হয়েছে। কিন্তু এই কথাগুলো শোনার মত বয়স তোমাদের হয় নি। যখন তোমরা বড় হবে তখন তোমরা এ বিষয়ে জানতে পারবে। তাদের কখনও বলবেন না যে, তোমরা ভুল করছ। তাদের বুলন, শিক্ষক তোমাদের বলেছে এতে সমস্যা নেই। কিন্তু যখন তোমরা বড় হবে তখন নিজেরাই এই বিষয়ে জানতে পারবে। যখন তোমরা নির্দিষ্ট বয়সে পৌঁছবে তখন তোমরা জবাব পেয়ে যাবে। তাই তাদের মাঝে এই অভ্যাস সৃষ্টি করুন, যেন সে সব বিষয়ে আপনাকে বলে। আপনাদের মাঝে বন্ধুসুলব সম্পর্ক হতে হবে।

দ্বিতীয়ত, তাদেরকে উত্তম বস্তু গ্রহণ করতে শেখান। তাদের চরিত্রের উপর বিরূপ প্রভাব রাখে এবং ধর্মীয় শিক্ষার পরিপন্থী- এমন বিষয়গুলো তাদেরকে বোঝান। তাদের হৃদয়ে গেঁথে দিন যে, তারা আহমদী। তাদেরকে বোঝাতে হবে যে, আহমদীয়াত কি? আহমদীয়াতই প্রকৃত ইসলাম। তাদের বলুন, আমরা আহমদী; আমাদের উদ্দেশ্য এবং করণীয় সম্পর্কে তাদেরকে বলুন। তাদেরকে জাগতিক বিষয়ে বলুন যে, তারা শুধুমাত্র জাগতিক স্বাচ্ছন্দ্য আর কামনা-বাসনার পিছনে ছুটছে। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য অনেক মহান। অতএব, তোমরা সেই উদ্দেশ্য লাভ করতে শৈশব থেকেই চেষ্টা কর। বাকি আনুষঙ্গিক বিষয় এবং জাগতিক বিষয়ে পরবর্তীতে তোমরা নিজেরাই জেনে যাবে। এভাবে ভাবের আদানপ্রদান হলে ধীরে ধীরে বন্ধুত্ব গড়ে উঠবে যার কারণে তারাও আপনাদের সব কথা বলবে। কিন্তু তারা যদি ভাবে যে, আমাদের বাবা-মা আমাদের কথা শুনবে না, আমাদের কোন জবাব দিবে না, তারা আমাদের প্রতি রাগ করবে, চুপ করিয়ে দিবে-তখন সমস্যা সৃষ্টি হবে।

প্রশ্ন: বৈশ্বিক সরকারব্যবস্থায় পবিত্র কুরআন করীম পোড়ানোর মত অপরাধ দমনে সীমিত পরিসরে ব্লাসফেমী আইন কি রাখা উচিত?

হুযুর আনোয়ার বলেন, এটা ব্লাসফেমী আইন রাখা বা না রাখার প্রশ্ন নয়। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর পবিত্র বস্তর, নবীদের এবং ঐশী কিতাবের সম্মান প্রতিষ্ঠিত করেছেন আর প্রতিষ্ঠিত রাখবেন। মানবসৃষ্ট আইন এগুলো পরিবর্তন করতে পারবে না। মূল বিষয় হল, তাদের বলতে হবে যে, তোমরাই বলে থাক অন্যের আবেগের সুরক্ষার জন্য আইন পাস করছ। আবার তোমরাই বলে থাক যে, এটি মতপ্রকাশের স্বাধীনতা। প্রত্যেকের নিজস্ব মতামত প্রকাশের অধিকার ও স্বাধীনতা রয়েছে। আর যদি এটি স্বাধীনতা হয়ে থাকে, তাহলে কারো মতামত যখন অন্যকে আঘাত করে তখন মতামত প্রকাশের সীমারেখা থাকা উচিত। স্বাধীনতার অর্থ এটি নয় যে, তোমরা মানুষের পকেট মারবে অর্থাৎ ছিনতাইকারী হয়ে যাবে। স্বাধীনতার মানে এটি নয় যে, তোমরা কারো ঘরে হামলাকরে জিনিসপত্র চুরি করবে। এটি কখনও স্বাধীনতা হতে পারে না। এমন করলে আইন শাস্তি দেয় না? একইভাবে তোমরা যে শাস্তিই নির্ধারণ কর না কেন, সেটা হোক ব্লাসফেমী বা অন্য কিছু; কিন্তু শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কমপক্ষে এই আইন পাস কর যে, একজন নাগরিককে অবশ্যই অন্যের আবেগ অনুভূতির সম্মান করতে হবে। আর যে সমাজে পারস্পরিক আবেগ অনুভূতির সম্মান করা হয় , সেখানে আপনা আপনিই একটি স্থায়ী শান্তির পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হবে। আর যখন শান্তি ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন কেউ অন্যের আবেগ অনুভূতি নিয়ে হাসি-তামাশা করবে না। এটাই মূল বিষয় যা পৃথিবীবাসীকে বোঝাতে হবে। এছাড়া ব্লাসফেমীর জন্য আল্লাহ্ তো কোন শাস্তি নির্ধারণ করেন নি। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, তোমরা ভাই-ভাই হয়ে থাক। একটু আগেই আপনারা কুরআনের আয়াতের তিলাওয়াত শুনেছেন- 'তোমরা পারস্পরিক আবেগ-অনুভূতির সম্মান কর।' যদি এই আইন আমরা সবাই মান্য করতে পারি, তাহলে আমাদের সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। যদি সবাই এই আইন বাস্তবায়ন করতে পারে যে, শুধুমাত্র অধিকার আদায় নয় বরং অন্যরে অধিকার প্রদান করাও আমাদের কাজ। যদি এই বিষয়টি সকল নাগরিক অনুধাবন করে, তবে এটিই আমাদের ধর্ম শিক্ষা দিবে। দুই বছর আগে ২০১৯ সালের জলসায় আমি অনেক অধিকারের কথা বলেছিলাম। এবছরও অনেক অধিকারের কথা বলেছি। যদি কেউ এসকল অধিকারের প্রতি মনোযোগ দেয় তাহলে সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ নেই। তখন ব্লাসফেমী আইন প্রয়োগের প্রশ্নই ওঠে না। অন্য কোন আইন থাকারও প্রয়োজন নেই। মূল বিষয় হল, পারস্পরিক আবেগ-অনুভূতির সম্মান করা। এই বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করা উচিত এবং নিজ জীবনে বাস্তবায়নকরা হলে সকল সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে এবং প্রেমপ্রীতি এবং ভ্রাতৃত্বপূর্ণ পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হবে। আর যখন এমন পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হবে তখন মানুষ একে অপরের আবেগ নিয়ে খেলবে না, হোক সেটি ধর্মীয় আবেগ বা ব্যক্তিগত আবেগ।

প্রশ্ন: কখনও যদি এমন সময় আসে যখন দাজ্জালী শক্তি আহমদী জামাতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। আর যদি এমন হয় তাহলে আহমদীদেরও কি যুদ্ধ করতে হবে?

হুযুর আনোয়ার বলেন:বিষয় হল, যখনই কোন সরকার বা জাতি ধর্মকে নির্মূল করার জন্য শক্তি প্রয়োগ করবে তখন আহমদীদের যুদ্ধ করা বা জিহাদ করার অনুমতি রয়েছে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, ঈসা মসীহ (আ.) যুদ্ধ রহিত করবেন। 'ইলতিওয়া' মানে হল স্থগিত রাখা, কিছু সময়ের জন রহিত করা। তকক্ষন পর্যন্ত বন্ধ রাখা যতক্ষণ পর্যন্ত সেই পরিস্থিতি সৃষ্টি না হয়। এখন ধর্মের বিনাশের জন্য অস্ত্রের ব্যবহার করার মত পরিস্থিতি নেই। যখন ধর্মের বিনাশ করার জন্য অস্ত্রের ব্যবহার হবে তখন মুসলমানদের জিহাদ করার অনুমতি রয়েছে। আর তখন আহমদীদের সবচেয়ে বেশী অগ্রগামী হতে হবে। কিন্তু এটি শুধুমাত্র ধর্মের খাতিরে। কিন্তু বর্তমানে যে সব যুদ্ধ করা হচ্ছে সেগুলো সব ভূ-রাজনৈতিক যুদ্ধ। আর তাতে স্বয়ং মুসলমানরা অন্যদের ধর্ম গ্রহণ করছে। মুসলমানেরাই অমুসলিমদের থেকে অস্ত্র ক্রয় করছে। মুসলমানরাই মুসলমানদের হত্যা করছে, তা- ও অন্যদের সহায়তায়। জিহাদ কিভাবে হল? আজকের জিহাদকে কি জিহাদ বলা যায়?

অতএব, এই যুগ কলমের জিহাদের যুগ। যেভাবে মসীহ মওউদ (আ.)-এর আগমণের বিষয়ে বুখারী শরীফে লেখা আছে, 'ইয়াজায়ুল হারব' অর্থাৎ যুদ্ধ রহিত হবে। কেননা, দাজ্জালী শক্তি এবং অন্যান্য ধর্মীয় নেতারা সাহিত্য, লেখনী এবং মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলামের বিরুদ্ধে কথাব বলবে। আর এর জবাবে এসব মাধ্যমই আমাদের ব্যবহার করা উচিত। হযত মসীহ মওউদ (আ.) কখনও বলেন নি যে, চিরতরে জিহাদের অবসান ঘটবে। তিনি বলেছেন, যারা এই কথা শোনার পরও যুদ্ধ করবে তারা অবিশ্বাসীদের কাছে পরাজিত এবং লাঞ্ছিত হবে। যে কাফির তোমার ধর্মের বিপক্ষে যুদ্ধ না করবে, তাদের বিরুদ্ধে যদি তোমরা জাগতিক স্বার্থের জন্য যুদ্ধ কর তাহলে অবশ্যই পরাজিত হবে। আর দেখুন, এখন ঠিকই মুসলমানরা মার খাচ্ছে। মসীহ মওউদ (আ.)-এর কথা সত্য সাব্যস্ত হয়েছে। হ্যাঁ অবশ্যই! তিনি বলেছেন, ঈসা মসীহ (আ.) যুদ্ধ রহিত করবেন। আর সেই পরিস্থিতি সৃষ্টির পূর্ব পর্যন্ত তিনি সত্য সত্য ধর্মযুদ্ধকে রহিত করেছেন। দোয়া করুন সেই অবস্থা যেন সৃষ্টি না হয়। আর যদি সেই অবস্থা সৃষ্টি হয় তাহলে আহমদীদের যুদ্ধ করার অনুমতি আছে। কেননা তখন শত্রুরা ধর্মকে বিনাশ করার চেষ্টা করবে। আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.) কে যুদ্ধ করার যে অনুমতি দিয়েছেন তা প্রথমবারের মত সূরা হজ্জে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়ে, তোমাদের যুদ্ধের অনুমতি এজন্য দেওয়া হয়েছে কেননা তারা এখন সীমালঙ্ঘন করেছে, তারা ধর্মকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছে। এখন যদি তাদের প্রতিহত না করা হয় তাহলে কোন সীনাগগ, চার্চ, মন্দির বা মসজিদ রক্ষা পাবে না। পবিত্র কুরআন সকল ধর্মের উপাসনালয়ের নাম বর্ণনা করেছে। এসক উপসনালয় সুরক্ষিত থাকবে না তাই যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। অতএব, ধর্মের বিরুদ্ধে যখন কোন যুদ্ধ হবে শুধুমাত্র তখনই ইসলামে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ইসলামে কখনও ভৌগলিক স্বার্থের জন্য যুদ্ধ করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। আর কখনও এই উদ্দেশ্যে মুসলমানরা যুদ্ধ করে নি। নৈরাজ্য দূর করতে যুদ্ধ করা হয়েছে। কখনও জাগতিক বা ভৌগলিক স্বার্থের জন্য ইসলামের যুদ্ধ করা হয় নি। কমপক্ষে মহানবী (সা.)-এর কোন খলীফা কখনও করেন নি। পরবর্তীতে মুসলিম বাদশাহরা খলীফা উপাধি নিয়ে এমন উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করেছে। কিন্তু তখন এই ক্ষেত্রে ইসলামী শিক্ষার বাস্তবায়ন ছিল না। ইসলামী শিক্ষার অনুসরণ খোলাফায়ে রাশেদীন পর্যন্ত ছিল। ইসলামী শিক্ষার বাস্তবিক প্রয়োগ এরপর ছিল না। এরপর যুদ্ধ হতে থেকেছে, কিছু বৈধ যুদ্ধও হয়েছিল আবার কিছু অবৈধও ছিল। তাই শুধুমাত্র নৈরাজ্য দূর করতে যুদ্ধ করা বৈধ। এজন্য সূরা হুজরাতে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, যদি দুটি জাতি যুদ্ধ করে, তুমি তাদের মাঝে শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা কর। আর যখন যুদ্ধ শেষ হয় তখন তাদের সাথে ন্যায় বিচার কর। যদি কোন জাতি অন্য জাতির সাথে সীমালঙ্ঘন করে, তাহলে তুমি সীমালঙ্ঘনের প্রতিবাদ কর। কিন্তু যদি যুদ্ধ শেষ হয়ে যায় তখন ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য তাদের উপর কোন ধরণের বিধিনিষেধ আরোপ করো না। যেভাবে আজকের পৃথিবীতে হচ্ছে। যুদ্ধের পরে তাদের দেশ পরিচালনায় স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। তারা নিজেদের মত দেশ পরিচালনা করুক, উন্নতি করুক। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কি হয়েছিল? দেশসমূহকে বিভক্ত করে দেওয়া হয় যাতে পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করে একত্র না হয়। এটি ন্যায় বিচার ছিল না। দাজ্জালী শক্তি মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোকে খণ্ডবিখণ্ড করে দিয়েছে, যাতে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে শক্তি সঞ্চয় না করতে পারে। তখন থেকেই নৈরাজ্য আর সংঘাত লেগেই আছে, যা দিন

এরপর ১১ পাতায়....

হযরত মৌলভী হেকীম নূরুদ্দীন (রা.)-এর নামে দ্বিতীয় বিয়ে প্রসঙ্গে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর লেখা পত্র

শ্রদ্ধেয় সম্মানিত প্রিয় ভ্রাতা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

আপনার পত্র পেয়ে অত্যন্ত খুশী হয়েছি। আল্লাহ্ তা'লা আপনার এবং আপনার নতুন স্ত্রীর মাঝে দাম্পত্য বন্ধন, ঐক্য ও ভালোবাসা সর্বাধিক বৃদ্ধি করুন এবং সৎ-সালেহ্ সন্তান-সন্ততি দান করুন, আমীন, সুম্মা আমীন। প্রথমা স্ত্রীরা সচরাচর এ ধরনের বিষয়াদিতে প্রকৃতিগত দুর্বলতার কারণে চরম সীমায় কুধাণার বশবর্তী হয়ে নিজেদের জীবন ও সুখ-শান্তির বিনাশ ঘটিয়ে থাকে।

স্ত্রীদের ওপর তৌহীদের অকাট্য দলিল'ওয়াহ্দাহু-লাশরিক' হওয়া খোদার গুণ। কিন্তু স্ত্রীরাও কখনো শরীক পছন্দ করে না। এক বুযূর্গ বলেন, তাঁর প্রতিবেশী এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে অনেক কঠোর ও কর্কশ আচরণ করতো। এক পর্যায়ে সে দ্বিতীয় বিয়ে করতে মনস্থ করলো। এতে সে স্ত্রী অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে স্বামীকে বললো, 'আমি তোমার সব যাতনা সহ্য করেছি কিন্তু এই দুঃখ আর সহ্য করা যায় না যে, তুমি আমার স্বামী হয়ে এখন দ্বিতীয় স্ত্রীকে আমার সঙ্গে শরীক করবে।' তিনি বলেন, 'তার সে কথা আমার হৃদয়ে বড়ই গভীর দাগ কাটলো, বেদনাত্মক প্রভাব বিস্তার করলো। আমি সে কথার সদৃশ বিষয় কুরআন করীমে খুঁজে দেখতে চাইলাম। তখন এ আয়াতটি খুঁজে পেলাম ঃ ওয়া ইয়াগফিরু মা দূনা যালিক।' (সূরা আন নিসা: ১১৭) এ (অর্থাৎ শরীক করা) ছাড়া আর সবই তিনি ক্ষমা করেন-অনুবাদক।

এ বিষয়টি বাহ্যত বড়ই নাজুক। দেখা যায়, পুরুষের আত্মমর্যাদাভিমান যেমন চায় না যে, তার স্ত্রী তার এবং অন্য কারও মাঝে ভাগাভাগী হোক, তেমনি স্ত্রীর মর্যাদাভিমানও চায় না, তার স্বামী তার এবং অপর কারও মাঝে বিভক্ত হোক। কিন্তু আমি খুব ভালোভাবে জানি, খোদা তা'লার শিক্ষায় কোন ত্রুটি নেই। এবং তা মানবপ্রকৃতি ও স্বভাব বিরুদ্ধও নয়। এ ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ গভেষণালব্ধ সত্য এটাই যে, পুরুষের মর্যাদাভিমান এমন এক প্রকৃত বাস্তব ও পরিপূর্ণ মর্যাদাভিমান, যা আলাদা বা বিচ্ছিন্ন হলে প্রকৃতপক্ষেই এর কোন প্রতিকার নেই। কিন্তু স্ত্রীর মর্যাদাভিমান পূর্ণাঙ্গ নয়, বরং সম্পূর্ণ সন্দেহাত্মক এবং ক্ষিয়মাণ।

মা'রেফতের গুঢ়তত্ত্ব

এ ক্ষেত্রে সেই গুঢ়তত্ত্ব যা মহানবী (সা.) উম্মে সালমা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে বলেছিলেন তা এক মা'রেফাত (তত্ত্বজ্ঞান) প্রদানকারী গুঢ়তত্ত্ব বিশেষ। কেননা মহানবী (সা.)-এর প্রস্তাব দিলে হযরত উম্মে সালমা রাযিয়াল্লাহু আনহা যখন এ ওজর-আপত্তি জানালেন, 'আপনার একাধিক স্ত্রী রয়েছেন এবং ভবিষ্যতে আরও হবে বলে খেয়াল আছে আর আমি একজন আত্মমর্যাদাভিমানী এমন নারী, যে দ্বিতীয় কোন স্ত্রী সইতে পারে না।' তখন মহানবী (সা.) বলেছিলেন, আমি তোমার জন্য দোয়া করবো, যেন খোদা তা'লা তোমার এই মর্যাদাভিমান দূর করে দেন এবং ধৈর্য দান করেন।'

কাজেই আপনিও দোয়ায় মশগুল থাকুন। নতুন স্ত্রীর মনোরঞ্জন অত্যাবশ্যক। কেননা সে হচ্ছে মেহমানের মত। তার ক্ষেত্রে আপনার আখলাক ও সদ্ব্যবহার উচ্চতর পর্যায়ের হওয়া দরকার। তার সাথে আপনি অকৃত্রিম মেলা-মেশা ও সহবাস করুন এবং আল্লাহ্ জাল্লাশানুহুর কাছে চান, তিনি যেন নিজ অনুগ্রহে তার সাথে আপনার নির্মল-নিখাদ ভালোবাসা ও প্রেমভরা সম্পর্ক সৃষ্টি করে দেন। কেননা এসব কিছুই আল্লাহ্ জাল্লাশানুহুর আয়ত্তাধীন। এখন তার সাথে বিয়ের মাধ্যমে আপনার এক নতুন জীবন শুরু হয়েছে। আর যেহেতুমানুষ জগতে চিরকালের জন্য আসে নি, কাজেই ভবিষ্যত বংশগত বরকত ও আশিস প্রকাশিত হওয়ার জন্য এখন এ সম্পর্কের ওপরই সব আশাভরসা। খোদা তা'লা আপনার জন্য এক মুবারক (আশিসমণ্ডিত) করুন। আমি এ মহল্লাবাসী বিশেষ ওয়াকেফহাল ও গোপন খবরাখবর জানা লোকদের কাছ থেকে এ মেয়েটির সম্পর্কে এ মর্মে অনেক প্রশংসা শুনেছি যে, সে স্বভাবত সৎ পুণ্যবতী, সতী-সাধ্বী ও প্রশংসনীয় সদ্‌গুণাবলীর আধার। তার তরবিয়ত ও শিক্ষা-দীক্ষার প্রতিও লক্ষ্য রাখুন। আপনি তাকে নিজে পড়াবেন, কেননা তার সহজাত ক্ষমতা ও প্রতিভা অতি উত্তম বলে মনে হয়। বস্তুত আল্লাহ্ জাল্লাশানুহুর এটা অতি অনুগ্রহ ও ইহ্সান যে, তিনি এ জোড়া মিলিয়েছেন। নচেৎ যোগ্য ও সৎ মানুষের এ অভাব ও দুর্ভিক্ষ কালে এমনটি ঘটা অসম্ভব বিষয়াবলীরই অন্তর্ভুক্ত। আপনার পত্রটি থেকে কিছুই জানা গেল না, ২০ মার্চ ১৮৮৯ ইং পর্যন্ত ছুটি পাবেন কি না। আপনি যদি ২০ কি ২২ তারিখে আসেন অর্থাৎ রবিবার এখানে থাকেন তাহলে বাবুমুহাম্মদ সাহেবও আপনার সাথে দেখা করবেন। এ অধম ১৫ মার্চ, ১৮৮৯ ইং তারিখে দু' তিন দিনের জন্য হুশিয়ারপুর যাওয়ার ইচ্ছা রাখে এবং ১৯ অথবা ২০ মার্চ তারিখে অবশ্যই ইনশাআল্লাহ্ ফিরে আসবে। সাহেযাদা ইফতিখার আহমদ এবং তাঁর আত্মীয়-স্বজন সবাই কুশলে আছেন। গতকাল নগদ সাত টাকা এবং কিছু কাপড় আমার জন্য পাঠিয়েছেন, যা তাঁর জোরালো অনুরোধের দরুন গ্রহণ করা হয়েছে।

ওয়াস্‌সালাম বিনীতগোলাম আহমদ

(আল হাকাম, ৩১ মে, ১৯০৩, পৃ: ৪৫)

****

১১ পাতার পর.....

প্রশ্ন: জনৈক বন্ধু মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ অর্থাৎ 'সন্তানদেরকে সাত বছর বয়সে নামাযের নির্দেশ দাও আর দশ বছর বয়সে নামায না পড়লে তাদেরকে শাস্তি দাও'– এ সম্পর্কে হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে দিকনির্দেশনা দেওয়ার অনুরোধ করেন। গত ২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখের পত্রে হুযূর আনোয়ার (আই.) নিম্নোক্ত উত্তর প্রদান করে বলেন,

উত্তর: ইসলামের শিক্ষার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল, এটি ভারসাম্যপূর্ণ শিক্ষা। মহানবী (সা.)-এর এই নির্দেশও নিজের মাঝে এই ভারসাম্যকেই ধারণ করেছে অর্থাৎ, মানব সৃষ্টির প্রধান উদ্দেশ্য হল ইবাদত। শৈশব থেকেই যদি এর প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং নিজেদের (ব্যবহারিক) আদর্শের মাধ্যমে সন্তানদেরকে নামায পড়ার জন্য অনুপ্রাণিত করা হয়, উপরন্তু তিন বছরের লাগাতার অনুপ্রেরণা উপদেশ দেওয়ার পরও যদি সন্তান এটি পালন না করে তাহলে তাকে একটি (নির্ধারিত) সময় পর্যন্ত যথোচিত শাস্তি দেওয়ার নির্দেশ রয়েছে। তবে, এই শাস্তি এমন হওয়া উচিত নয় যাতে শাস্তি প্রদানকারীর পক্ষ থেকে সেই বাচ্চার প্রতি শত্রুতার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে অথবা মানুষ যেন এটি মনে না করে যে, এই শাস্তির মাধ্যমে সে ঐ বাচ্চাকে অবশ্যই নামাযে অভ্যস্ত করতে পারবে। বরং এরূপ শাস্তির ক্ষেত্রেও এমন বিষয়ই দৃষ্টিপটে থাকা উচিত যে, কেবল আল্লাহ্‌র কৃপায়ই (সন্তানদের) তরবীয়ত হতে পারে, যা লাভের আসল উপায় হল, দোয়া। আর শাস্তি দেওয়ার যে পন্থা অবলম্বন করা হচ্ছে তা-ও মূলত আল্লাহ্ তা'লার রসূলের নির্দেশে অবলম্বন করা হচ্ছে যাতে সন্তান এর মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করে নামাযের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যায়। আর সন্তান যখন পরিণত হয়ে যায় আর বারো-তের বছর বয়সে উপনীত হয়ে ভাল-মন্দের মাঝে প্রভেদ করার শক্তি তার মাঝে সৃষ্টি হয়ে যায় তখন তার বিষয়টি আল্লাহ্ তা'লার হাতে ছেড়ে দিয়ে তার জন্য কেবলমাত্র দোয়া এবং সদুপদেশ দেওয়ার রীতি বেছে নেওয়া উচিত। এধরনের শাস্তি সম্পর্কেই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "কেউ যদি নিঃস্বার্থ হয়, নিজের প্রবৃত্তির লাগামকে নিয়ন্ত্রণাধীন রাখে, পূর্ণ ধৈর্যশীল, সহিষ্ণু, শান্তিপ্রিয় এবং মর্যাদাশীল হয় তাহলে কোনো যথোপযুক্ত সময়ে সন্তানকে কিছুটা শাস্তি দেওয়ার কিংবা চোখ রাঙানোর অধিকার তার রয়েছে।"

প্রশ্ন: গত ১৫ই আগস্ট, ২০২০ তারিখে হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর সাথে কানাডার আতফালের ভার্চুয়াল সাক্ষাতে এক তিফল হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে জানতে চায় যে, ইসলামের শিক্ষানুযায়ী আমরা রক্তদান এবং মৃত্যুর পর আমাদের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান করতে পারবো কি? হুযূর আনোয়ার (আই.) এর নিম্নোক্ত উত্তর প্রদান করেন।

উত্তর: অবশ্যই করতে পারবে, বরং মৃত্যুর পূর্বেও করতে পারবে। অনেকে নিজের কিডনি দান করে। কেউ আবার নিজের লিভার দান করে। কিন্তু অন্যান্য Organs বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আমরা মৃত্যুর পর দান করতে পারি। এটি উত্তম কাজ। মানবসেবার উদ্দেশ্যে তুমি যে কাজই করবে আল্লাহ্ তা'লা তার অনুমতি দিয়েছেন, আর এটি খুবই উত্তম কাজ।

প্রশ্ন: একই সাক্ষাতে আরেকজন তিফল হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে নিবেদন করে যে, খোদা তা'লার সাথে আমরা কীভাবে সম্পর্ক গড়তে পারি? হুযূর আনোয়ার (আই.) এই প্রশ্নের নিম্নোক্ত উত্তর প্রদান করেন।

উত্তর: আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, আমি তোমাদেরকে আমার ইবাদতের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছি। তোমরা আমার ইবাদত কর। আমাকে এক-অদ্বিতীয় জ্ঞান কর। আমরা নির্দেশাবলী মান্য কর। আমার নবী তোমাদের কাছে যে শিক্ষা নিয়ে আসে, তার ওপর আমল কর, তাহলে তোমরা আমার নৈকট্য লাভ করবে। ইহজগতে তোমরা যখন কারও সাথে বন্ধুত্ব কর তখন তোমরা তার কথা শোনো, তাই না? তার কথা শোনো বলেই তারা তোমাদের সাথে বন্ধুত্ব করে, তাই না? তুমি আর সে যদি বন্ধু হও আর তোমার বন্ধু তোমার কথা না শোনে আর তুমি তার কথা না শোনো তাহলে আর বন্ধুত্ব থাকবে না, তাই না? কাজেই, আল্লাহ্ তা'লাও একথাই বলেছেন যে, আমার সাথে বন্ধুত্ব কর। তোমরা আমার কথা মেনে চল তাহলে আমিও তোমাদের কথা শুনব। আর এভাবেই সম্পর্ক গড়ে উঠবে।

প্রশ্ন: একই সাক্ষাতে আরেকজন তিফল হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে নিবেদন করে যে, আজকাল করোনা ভাইরাস বিস্তার লাভ করেছে। হুযূরের জন্য কবে সফর করা নিরাপদ হবে আর হুযূর কবে কানাডায় আসবেন? হুযূর আনোয়ার (আই.) নিম্নোক্ত বাক্যে এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। হুযূর (আই.) বলেন,

উত্তর: করোনা ভাইরাস কবে শেষ হবে তা তো আমি জানি না। তুমি তো নিজেই বলছো করোনা ভাইরাস বিস্তার লাভ করেছে, তাই এখন সফর করা সম্ভব নয়। কাজেই দোয়া কর, যখন করোনা ভাইরাস শেষ হয়ে যাবে তখন কানাডার সফরও করা হবে। এটি তোমাদের দোয়ার ওপর নির্ভর করে যে, কত তাড়াতাড়ি তোমরা আল্লাহ্ তা'লার কাছে তার আশিস কামনা করবে। আল্লাহ্ তা'লার সমীপে করুণা যাচনা করলে অচিরেই এই ব্যাধি দূর হয়ে যাবে। এছাড়া তোমাদের দেশের মত আরও অনেক দেশ আছে যারা বলে যে, (হুযূর আপনি আমাদের দেশে) আসুন! কিন্তু (আমি) যেতে পারছি না। এখন এটিও জানি না যে, কানাডার পালা কবে আসবে। যখন করোনা ভাইরাস শেষ হয়ে যাবে, সফরের অনুমতি মিলবে তখন আমি যেতে না পারলেও তুমি চলে এস, এখানে এসে সাক্ষাত করে নিও। ঠিক আছে? এমনিতে তোমাদের মসজিদ ইত্যাদি দেখে এখন আমার মনে হচ্ছে, আমি এখন কানাডাতেই বসে আছি। যেভাবে ইথারের সাহায্যে আমরা কানাডা পরিদর্শন করছি, এখন আমরা সবকিছুই (ভার্চুয়ালী) পরিদর্শন করছি। এরপূর্বে যে তিফল মে'রাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল, এসব দৃশ্যই মহানবী (সা.)-কে স্যাটেলাইট বা ভূ-উপগ্রহের মাধ্যম ছাড়াই (আল্লাহ্ তা'লা) জান্নাতের Distant View বা দূরবর্তী দৃশ্য দেখিয়েছিলেন। যেমনটি (এখন) আমি তোমাদের মসজিদ দেখতে পাচ্ছি। আর আমার মনে পড়ছে যে, অমুক স্থানে বসে আমি তোমাদের একজন সাংবাদিককে সাক্ষাৎকারও দিয়েছিলাম। মসজিদের পেছনের অংশের ঐ কর্ণারটিও আমি দেখতে পাচ্ছি যে, (সেটি) কোথায় ছিল। অতএব, এভাবে দৃশ্যাবলী দেখেই (কোনো কিছু সম্পর্কে) জানা যায়। যাহোক, আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করুন। যখন করোনা ভাইরাস নির্মূল হবে তখন আসব, ইনশাআল্লাহ্। যত জোরালোভাবে তোমরা দোয়া করবে তত দ্রুত আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করবেন

দিন বেড়েই চলেছে। তারা এখন নিজেরাই দাজ্জালের সাথে মিলে আছে। যুদ্ধ কির করবে- মুসলমানরাই দাজ্জালের সাথে মিলে আছে।

প্রশ্ন: হুযুর , আপনি সাম্প্রতিক সময়ে নারীদের অধিকার নিয়ে কথা বলেছেন। তারা কী কী বিষয়ে স্বামীর কাছে দাবি করতে পারে- সে বিষয়ে বলেছেন। একইভাবে স্বামী হিসেবে একজন পুরুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য কী- সেটা স্পষ্ট করেছেন। হুযুর! একজন নারীর তার স্বামীর এবং তার পরিবারের প্রতি কী দায়িত্ব রয়েছে? পুরুষের তার স্ত্রী প্রতি কী অধিকার রয়েছে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: প্রথম বিষয় আপনি বলেছেন, 'আজকাল আপনি নারীদের অধিকার নিয়ে কথা বলছেন।' আজকাল আমি তো নারীদের অধিকার নিয়ে কথা বলছি না। আমি আজকাল ইসলামি ইতিহাস ও বদরী সাহাবীদের সম্পর্কে খুতবা দিচ্ছি। হ্যাঁ, আপনি বলতে পারেন, আমার সাম্প্রতিক জলসা সালানার বক্তৃতায় আমি নারীর অধিকার নিয়ে আলোচনা করেছি। আপনি যদি নারীদের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে নির্দেশনামূলক পূর্বের আমার কথা ছেড়ে কেবলমাত্র এই বক্তৃতার কথা ধরে বসেন, যদি আপনি এই বক্তৃতাই মনোযোগ দিয়ে শোনেন; তবে আমি অবাক হচ্ছি মানুষ হয়তো মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শোনে নি। আর যেহেতু কিছু বিষয় স্পষ্টভাবে তাদের পক্ষে গেছে নারীরা তাই শুধুমাত্র সেগুলোকে গুরুত্ব দিয়েছে। আমি এই বক্তৃতায় নারীদের দায়িত্ব নিয়েও কথা বলেছি। আমি বিস্তারিত হাদীদের সারাংশ উপস্থাপন করেছি; যেখানে এক নারী মহানবী (সা.) এর কাছে আসে এবং বলে, পুরুষরা নামায পড়ে, আর্থিক কুরবানী করে, আয় করে, এরপর জিহাদ করে এবং হজ্জ করে। আর নারীরা এমন কাজ করতে পারে না। তাই নারীরা কিভাবে ঘরে বসে একই পুরস্কার পেতে পারে, যেভাবে পুরুষরা জিহাদে গিয়ে লাভ করে। মহানবী (সা.) বলেন, হ্যাঁ! তোমরাও একই পুরস্কার পেতে পার। এখঅনে এটা বলা হয় নি যে, পুরুষের কোন অধিকার নেই। এখানে বলা হয়েছে, নারীর পুরস্কার পুরুষের সমান। নারী পুরুষের সমান অধিকার এবং সমান পুরস্কার। পবিত্র কুরআন করীমে আল্লাহ্ তা'লা অনেকবার বলেছেন, নারী ও পুরুষকে তার সৎকর্মের জন্য উত্তম প্রতিদান দেওয়া হবে। নারী এবং পুরুষ সমান প্রতিদান লাভ করবে। এমনকি নারী ও পুরুষ উভয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সেই মহিলা এটাও বলেছি যে,তারা ঘরের দেখাশোনা করে। এর মানে হল,তারা যখন ঘরের দেখাশোনা করবে তখন পুরস্কার লাভ হবে। যদি কেউ এই হাদীসে মনোযোগ দেয় তাহলে সে দেখবে যে, সেই নারী বলেছিল যে, সে ঘরের দেখাশোনা করে অর্থাৎ সে দায়িত্ব পালনকারী একজন নারী। সে সন্তানের লালনপালন করে এবং তাদের উত্তম তরবীয়ত দেয়। এক কথা সে স্বামীর ঘরের তত্ত্বধায়ক। ঘরে স্বামীর সম্পদের সুরক্ষা করে। স্বামীর সম্মান ও মর্যাদার সুরক্ষা করে। অর্থাৎ সে স্বামীর বিশ্বস্ততা রক্ষা করে এবং সে স্বামীর অধিকার আদায়কারী একজন নারী। আর এ কারণেই মহানবী (সা.) বলেছেন, যদি তুমি এসকল কাজ কর, তাহলে তোমরাও পুরুষের জিহাদ, হজ্জ এবং তাদের ইবাদতের সমান পুরস্কার লাভ করতে পারবে। এভাবে এই হাদীসে নারীদেরও উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তোমররা এই কাজ করলে পুরস্কার লাভ করবে। এইকথা কখন বলেছেন যে, ঘরে বসেই পুরস্কার লাভ হবে? বিভিন্ন দায়িত্বের কথা বলে সেই মহিলা বলেছেন যে, তারা এসব দায়িত্ব পালন করে, এর বদলে কি তারা পুরস্কার লাভ করবে?

মহানবী (সা.) বলেছেন,অবশ্যই! তোমরা যদি এগুলো করে থাক, যদি সন্তানদের সঠিক তরবীয়ত করে থাক, স্বামীর ঘরের দেখাশোনা কর, তার অবর্তমানে যদি বিশ্বস্ততরা রক্ষা কর, যদি তার সম্পদের সুরকষা কর এবং সকল দিক দিয়ে তার সেবা করে থাক তাহলে নিশ্চিতভাবে তোমাদের ততটাই পুরস্কার লাভ হবে যতটা পুরুষরা জিহাদ করার মাধ্যমে লাভ করবে। অতএব, এগুলো হল নারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য। আপনি কিভাবে বললেন যে, আমি শুধুমাত্র নারীর অধিকার নিয়ে কথা বলেছি। এই হাদীসে একই সাথে ঘরে নারীর অনেক দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে। যদি আপনার স্ত্রী আপনার সন্তানের উত্তম তরবীয়ত নিশ্চিত করে তাহলে কি সে আপনার থেকে বিনম্র আচরণ পেতে পারে না? যদি আপনার স্ত্রী আপনার ঘরের দেখাশোনা করে তাহলে কি সে ভাল আচরণ পেতে পারে না? যদি আপনার স্ত্রী তার সম্মান ও মর্যাদা সমুন্নত রাখে এবং আপনার প্রতি আন্তরিক হয় এবং বিশ্বস্ততা রক্ষা করে এবং সে যদি আপনার ভালবাসার অধিকার আদায় করে তাহলে কি সে উত্তম আচরণ পেতে পারে না? পেতে পারে কি না? তাহলে কীভাবে শুধুমাত্র নারীর অধিকার নিয়ে কথা বললাম?বলং নারী ও পুরুষ উভয়ের অধিকারের কথা বলা হয়েছে। যদি কেউ এই হাদীসে মনোযোগ দেয় তাহলে সে নারী ও পুরুষ উভয়ের অধিকার দেখতে পাবে। অতএব, উভয়ের এই অধিকার রয়েছে। পুরুষকে অমুক কাজের জন্য পুরস্কার দেওয়া হবে আর নারীদের অমুক অমুক কাজের প্রতিদান দেওয়া হবে। হ্যাঁ পুরুষকে বলা হয়েছে তোমরা নারীর সাথে উত্তম আচরণ কর। এ কারণে নারীর সাথে উত্তম আচরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যদি নারী তোমার অধিকার আদায় করে তাহলে তাদের সাথে উত্তম আচরণ করা আবশ্যক।

প্রশ্ন: আমরা সাধারণত দেখে থাকি মিডিয়ার আমাদের মুসলিমদেরকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে টার্গেট করা হয়। আমার প্রশ্ন হল, তারা কেন মুসলমানদের টার্গেট করে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: তারা কেন করে থাকে, এটা শুধু মাত্র তারাই বলতে পারবে। এজন ব্যক্তি যদি বোকার মত আচরণ করে এবং অন্যায় আচরণ করে তাহলে তাকেই জিজ্ঞাসা করতে হবে যে, কেন করে? আমি তোমাকে কিভাবে বলব? হ্যাঁ, প্রকৃত বিষয় হল, পৃথিবীবাসী ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা জানে না। পৃথিবীবাসী দেখছে যে, সিরিয়ায় মুসলিমরা একে অপরকে হত্যা করছে। তারা দেখছে ইয়েমেনে অন্যায় হচ্ছে, তালেবান অন্যায় অবিচার করছে, আল কায়দা অন্যায় করছে। পৃথিবীবাসী দেখছে, মুসলমানরা কিছু বিষয়ে ইউরোপের বিরুদ্ধে কথা বলছে। যদিও কিছু বিষয় আসলেই ঠিক না। এছাড়া বোকো হারাম আল শাবাব সহ এরকম অনেক সংগঠন, যারা মুসলমান হওয়ার দাবি করে আবার অন্যায় আচরণ করে। এই কারণে পৃথিবীবাসী ইসলামকে টার্গেট করছে। যদি আমরা তাদেরকে প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা বলি, যেভাবে আমরা আমাদের শান্তি সম্মেলন করে থাকি অথবা আমি যেখানেই যাই সেখানেই শান্তি সম্মেলনের মাধ্যমে বলে থাকি। আমি বেশ কয়েকবারই বলেছি। যেমন গতকাল খুতবায় আমি ঘটনা শুনিয়েছি আর সব সময় শুনিয়ে থাকি। এই ইসলামকে সমর্থন করতে এবং এর সপক্ষে কথা বলতে সবাই প্রস্তুত। তাই দুর্বলতা আমাদের, কেননা আমরা পৃথিবীবাসীকে ইসলামের শিক্ষা জানাচ্ছি না। এই যুগে পৃথিবীবাসীকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা জানানো হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর জামাতের কাজ। অতএব, এটি আপনাদের দায়িত্ব; যখনই কোন ঘটনা ঘটে তখন ইসলামের শিক্ষা স্পষ্ট করে বর্ণনা করুন যে, এটা হল ইসলামের শিক্ষা, এটা সঠিক আর এটা ভুল। ইসলাম সম্পর্কে ছোট ছোট প্রবন্ধ লিখতে থাকুন। কোন সুযোগ ফসকে যেতে দিবেন না। অতএব যখন পৃথিবীবাসী সত্য অনুধাবন করবে এবং প্রকৃত ইসলামে শিক্ষা অনুধাবন করবে, তখন তারা ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলবে না। অতএব, এই যুগে পৃথিবীবাসীকে জানানো আমাদের দায়িত্ব। আর যতদূর সম্ভব আমরা জানাই। আপনারাও আপনাদের দেশে প্রচার করুন। শান্তির বিষয়ে বিজ্ঞাপন দিন, লিফলেট বিতরণ করুন। ডেনমার্ক অনেক ছোট দেশ। আপনাদের দেশের প্রত্যেক নাগরিকের কাছে ইসলামের শান্তির শিক্ষা পৌঁছানো উচিত। আপনারা লিফলেট বিতরণ করুন। আপনাদের জনসংখ্যা কত?

প্রশ্নকারী: ৫০ লক্ষ।

হুযুর আনোয়ার বলেন, ৫০ লক্ষ তো কোন বড় সংখ্যা নয়। ৫০ লক্ষ মানুষের কাছে সহজে লিফলেট পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। তাদের সামনে ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা তুলে ধরুন। প্রথমত এটি প্রচার করুন। এরপর বলুন, ইসলামের এই সুন্দর শিক্ষা প্রচারের জন্য আল্লাহ্ তা'লা মসীহ মওউদ (আ.) কে প্রেরণ করেছেন। যতক্ষন পর্যন্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে এই বাণী না পৌঁছায় ততক্ষণ এই সবকিছুই আমাদের দায়িত্ব। মিডিয়ার সাথে বন্ধুত্ব করুন এবং তাদেরকে অবহিত করুন। তাদেরকে আপনাদের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত করুন এবং সম্পৃক্ত করুন। তাদের সাথে একটি বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরী করুন, যাতে তারা আপনার প্রবন্ধ প্রকাশ করে। তখন তারা সত্য অনুধাবন করতে পারবে। অন্যথায় যদি মিডিয়া শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় মুসলমানদের অন্যায় কাজ দেখে তাহলে মিডিয়া যা দেখছে তাই বলবে। যখন আমরা তাদেরকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা জানাই তখন তারা লজ্জিত হয়ে বলে; ভুলবশত আগের রিপোর্ট করা হয়েছে। আমার সামনে অনেকেই এমন বলেছে এবং তারা এরপর থেকে ইসলামের সপক্ষে লিখেছে।

(২ পাতার পর.....)

বিয়ে করার অনুমতি দিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

তাই এ বিষয়টির সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। (আল্ ফযল পত্রিকা, কাদিয়ান দ্বারুল আমান, ৪ মে, ১৯১৪, পৃ: ১৪)

কাজেই, আমার মতে বিধবা হওয়ার সময় যদি কোনো মহিলা গর্ভবতী থাকে আর চার মাস দশদিন পূর্ণ হওয়ার পরও যদি তার গর্ভকাল চলতে থাকে তাহলে সে সন্তান ভূমিষ্ট হওয়া পর্যন্ত (ইদ্দতের) মেয়াদ পার করবে আর যদি চার মাস দশদিন পূর্বেই সন্তান ভূমিষ্ট হয় তবুও সে চার মাস দশদিন সময় পূর্ণ করবে। আমার এই সিদ্ধান্ত প্রদানের ভিত্তি হচ্ছে সেই হাদীস যাতে একথা উল্লেখ রয়েছে যে, কারও মৃত্যুতে তিনদিনের বেশি শোক পালনের অনুমতি নেই, তবে বিধবা ছাড়া; যে নিজের স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশদিন শোক পালন করবে।

(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল জানায়েয, বাব: এহদাদিল মারআতি আলা গাইরি যওজিহা) এই হাদীস এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দেয় যে, এখানে তালাকপ্রাপ্তা কিংবা গর্ভবতী হওয়ার শর্ত প্রযোজ্য নয়। এখানে বিয়োগ বেদনার বা শোক পালনের যে সময়কাল বর্ণনা করা হয়েছে তা হল, চার মাস দশদিন। যদি শুধুমাত্র এটি দেখা হত যে, এই সময়ের মধ্যে গর্ভাবস্থা সুস্পষ্ট হয়ে যাবে তাহলে এখানেও তালাকপ্রাপ্তার শর্তই নির্ধারণ করা যেত কিন্তু চার মাস দশদিন সময়কাল নির্ধারিত করার ফলে আল্লাহ্ তা'লার উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় এটি বোধগম্য হয় যে, এই সময়ের মধ্যে গর্ভাবস্থাও সুস্পষ্ট হয়ে যায় আর এছাড়া বিমর্ষতার যে অবস্থা তাও কেটে যায়। তাই তালাকের ক্ষেত্রে ইদ্দতের মেয়াদকাল সন্তান ভূমিষ্ট হওয়া পর্যন্ত অথবা তিন মাস রাখা হয়েছে। কিন্তু (স্বামী) বিয়োগের ক্ষেত্রে চার মাস দশদিনের শর্ত অবশ্যই পূর্ণ হতে হবে।

কাজেই, আমার মতে (স্বামী) বিয়োগের ক্ষেত্রে ইদ্দতের মেয়াদ হল, চার মাস দশদিন, তা সে গর্ভবতী হোক বা না হোক। আর সে যদি গর্ভবতী হয় এবং চার মাস দশদিনের পূর্বেই সন্তান প্রসব হয়ে যায় তবুও তার ইদ্দতের মেয়াদকাল চার মাস দশদিনই হবে, যা সে পূর্ণ করবে। আর এটি মহানবী (সা.)-এর এই বক্তব্য সম্মত যে, নারীর জন্য শোকপালনের মেয়াদকাল চার মাস দশদিন। আর পবিত্র কুরআনের নির্দেশও এটিই।

যুগ ইমামের বাণী

তোমরা একথা ভুলে যেও না যে, খোদা তা'লার কৃপা ও অনুগ্রহ ব্যতিরেকে তোমরা আদৌ জীবিত থাকতে পার না। (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬২৯)

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam, Nararvita (Assam)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly

BADAR

Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-8 Thursday, 17 Aug, 2023 Issue No.33

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

তারীখে আহমদীয়াতে লুধিয়ানায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে বিরোধী ব্যক্তির বয়আত গ্রহণ

সেই সময় মোখালেফাতের কেন্দ্র হয়ে গিয়েছিল লুধিয়ানা। কিন্তুসেই উত্তপ্ত পরিবেশেও আল্লাহ্ তা'লার ফেরেশতারা সৌভাগ্যবান আত্মাদেরকে টেনে টেনে খোদা তা'লার প্রত্যাদিষ্টের জামা'তে নিয়ে আসছিল। লাহোর থেকে একজন প্রসিদ্ধ মৌলভী রহিম উল্লাহ সাহেব আসলেন আর আসা মাত্রই হুযূর (আ.)-এর নিকটে বয়আত করেন। তার পূর্বে মৌলভী গোলাম নবী সাহেব খোশাব-এর অধিবাসী লুধিয়ানায় আসে এবং আসার সাথে সাথে হযরত আকদাস (আ.)-এর বিরোধিতায় বক্তৃতা আরম্ভ করে। শহরে তার বক্তৃতার ধুম পড়ে যায় আর সর্বত্র তার জ্ঞান এবং প্রসিদ্ধির চর্চা হতে থাকে। একদিন ঘটনাক্রমে মৌলভী সাহেবের ওয়াজ সেই মহল্লাতেই হওয়ার ছিল যেখানে হুযূর (আ.) এসেছিলেন। ওয়াজ এত প্রভাব সৃষ্টিকারী ছিল যে, প্রশংসা ধ্বনি উচ্চকিত হতে থাকে। আর চতুর্দিক থেকে মারহাবার উচ্চ রব ওঠে। সেই ওয়াজে লুধিয়ানার সকল মৌলভী উপস্থিত ছিল আর তার উচ্চাঙ্গীন বর্ণনা এবং জ্ঞানের বারবার প্রশংসা করছিল। হযরত আকদাস (আ.) ভিতরে ছিলেন আর 'ইজালাহে আওহাম'-এর খসড়া তৈরি করছিলেন। মৌলভী সাহেব ওয়াজ করে পূর্ণ বিরোধিতার অবস্থা সৃষ্টি করে বের হয় আর তার সাথে একটি বড় দল ও আলেমরাও ছিল । অপর দিকে হযরত আকদাস (আ.) এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যাওয়ার জন্য বের হন তখন মৌলভী সাহেবের সাথে সামনাসামনি সাক্ষাৎ হয়ে যায়। আর হযরত আকদাস (আ.) স্বয়ং আসসালামু আলাইকুম বলে হাত মিলানোর জন্য হাত বাড়িয়ে দেন যার ফলে মৌলভী সাহেবও উত্তরে ওয়ালাইকুমুসসালাম বলে করমর্দন করে।

মুসাফা করার সাথে সাথে মৌলভী সাহেব স্বয়ং নিজেই হযরত আকদাস (আ.)-এর হাতে হাত রেখে তার সাথে সোজা পুরুষদের অংশে চলে আসে এবং হযরতের সামনে হাঁটু গেঁড়ে বসে যায়। বাইরের মানুষজন আশ্চর্য হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সেখানকার আলেমরা জনগণকে যারা বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা বলছিল আশ্বস্ত করে যে, মৌলভী সাহেব মির্যা সাহেবের খবর করতে গিয়েছেন তিনি সেখানে তাকে পরাস্ত করে আসবেন। কিন্তু ঐশী সিদ্ধান্ত কিছুটা ভিন্ন নির্ধারিত ছিল। মৌলভী গোলাম নবী সাহেব যখন ভিতরে প্রবেশ করেন তখন মৌলভী সাহেব জিজ্ঞেস করেন। হুযূর! আপনি ওফাতে মসীহ্র বিষয়টি কোথা থেকে নিয়েছেন?

হযরত আকদাস: কুরআন শরীফ, হাদীস শরীফ এবং খোদাপ্রেমী আলেমদের উদ্ধৃতি থেকে।

মৌলভী সাহেব: কোনো আয়াত কুরআন শরীফে ওফাতে মসীহ্ সম্পর্কে থাকলে বলে দিন। হযরত আকদাস কুরআন শরীফের দুটি স্থানে কাগজের নিশানা রেখে মৌলভী সাহেবের হাতে দেন। একটি ছিল সূরা আলে ইমরানের ছয় নম্বর রুকু আর অপরটি সূরা মায়েদার শেষ রুকু।

প্রথমটির আয়াত ইয়া ঈসা ইন্নি মুতাওয়াফফীকাআর অপরটিতে ফালাম্মা তাওয়াফফাইতানীছিল। মৌলভী সাহেব আয়াত দুটি দেখে হতভম্ব হয়ে যায় আর বলতে থাকে, 'ইউ ওয়াফফি উজুরাহুম'-ও কুরআন শরীফের মধ্যে রয়েছে, তো এর অর্থ কী হবে??

হযরত আকদাস বলেন: এটি অন্য বাবের অন্তর্ভূক্ত আর সেটি অন্য বাবের। মৌলভী সাহেব কয়েক মিনিটের জন্য হতভম্ব হয়ে যায় আর অনেক চিন্তা-ভাবনার

পর বলে, মাফ করবেন! আমার ভুল ছিল, আপনি যা কিছু বলেছেন সঠিক কুরআন মজীদ আপনার সঙ্গে রয়েছে।

হযরত আকদাস (আ.) বললেন, যখন কুরআন শরীফ আমার সাথে তাহলে আপনি কার সাথে?

মৌলভী সাহেব এটি শুনে কেঁদে ফেলেন এমনকি তার দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। এরপর নিবেদন করেন, এই গুনাহ্গার বান্দা হুযূরের সাথে আছে।

এরপর মৌলভী সাহেব পুনরায় কাঁদতে শুরু করেন আর সামনে আদবের সাথে বসে থাকেন।

ভিতরে তো মৌলভী সাহেবের বিশ্বাসের মাঝে এই বিপ্লব সাধিত হয় অপরদিকে বাইরে কয়েক হাজার মানুষ দাঁড়িয়ে এই অপেক্ষায় আনন্দে করতালি দিচ্ছিল যে, আজ মির্যা অপদস্থ হবে, আজ মির্যা সাহেবকে তওবা করতে হবে। যাহোক যখন অনেক দেরি হয়ে যায় তখন লোকজন ডেকে ডেকে বলতে থাকে; জনাব মৌলভী সাহেব বাইরে আসুন। মৌলভী সাহেব একথা বলে পাঠান যে, তোমরা চলে যাও আমি সত্যকে দেখেছি এবং সত্য পেয়ে গেছি, এখন আমার তোমাদের সাথে কোনো কাজ নেই। যদি তোমরা নিজেদের ঈমানের সুরক্ষা করতে চাও তাহলে চলে আসো এই ইমামকে মেনে নাও। আমি এই সত্য ইমামের সাথে কীভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারি যিনি আল্লাহ্ তা'লার প্রত্যাদিষ্ট এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতিশ্রুত এবং যাকে স্বয়ং হযরত মুহাম্মদ (সা.) সালাম দিয়েছেন? উক্ত হাদীসের শব্দাবলী পাঠ করেন এরপর হযরত আকদাস-এর দিকে মনোনিবেশ করেন। পুনরায় তার (আ.) সামনে এই হাদীসটি দ্বিতীয়বার অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে পাঠ করেন এবং নিবেদন করেন আমি এখন মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী আপনাকে সালাম দিচ্ছি। হযরত আকদাস (আ.) সেই সময় এমন এক অদ্ভুত ধরন ও অদ্ভুত আওয়াজে ওয়ালাইকুমুসসালাম বলেন যে, মৌলভী সাহেব জবাইকৃত মোরগের ন্যায় ছটফট করতে থাকেন।

সেই সময় হযরত আকদাস (আ.)-এর চেহারায় এক অদ্ভুত অবস্থা বিরজমান ছিল এবং উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যেও এক অদ্ভুত অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল। বাইরের লোকজনের নিকটে যখন মৌলভী সাহেবের এই সংবাদ পৌঁছায় যে, আমি সত্যকে পেয়ে গিয়েছি তখন সবার মুখে কাফের কাফের চিৎকার শুরু হয় আর গালির বর্ষণ হতে থাকে এরপর সবাই চলে যায়।

পরবর্তীতে আলেমদের পক্ষ থেকে মৌলভী গোলাম নবী সাহেবের নিকটে মুবাহেসার পয়গাম আসতে থাকে, মৌলভী সাহেব তা গ্রহণ করেন, কিন্তু মুবহেসার জন্য কেউ আসে নাই। মৌলভী গোলাম নবী সাহেব মুবাহেসার জন্য ইশতেহারও প্রকাশ করেন যে, আমি প্রস্তুত আছি, যার জ্ঞানের দাবী রয়েছে সে আমার সাথে বাহাস করুন।

এরপর মৌলভী গোলাম নবী সাহেব এই ইশতেহার দেন, যে-ব্যক্তি হযরত ঈসা (আ.)-এর (দৈহিক) জীবিত থাকার প্রমাণ কুরআন শরীফের স্পষ্ট আয়াত এবং সহীহ হাদীস উপস্থাপন করবে তাকে প্রত্যেক আয়াত এবং প্রত্যেক হাদীসের জন্য দশ হাজার রুপি পুরস্কার দিব। আর রুপি প্রথমেই ব্যাংকে জমা করে দেওয়া হবে। এই ইশতেহার দেখেও কারও ময়দানে আসার সাহস হয় নি। তখন গোলাম নবী সাহেব (রা.) কেবলমাত্র হযরত আকদাস (আ.)-এর জন্য নিবেদিত প্রাণ হয়ে যান। তার অবস্থা এমন হয় যে, যখনই কোনো মৌলবী অথবা কোনো ব্যক্তি আসতো তার সাথে কথা বলার জন্য এবং মুবাহেসা করার জন্য উদগ্রীব হয়ে যেতেন এবং হযরত আকদাস (আ.)-এর (পবিত্র) চেহারা দেখতে থাকতেন আর খুশিতে উদ্বেলিত হতেন।

মৌলভী সাহেব কোথাও চাকুরি করতেন, সেখান থেকে চিঠি আসে যে, দ্রুত চলে আসুন নতুবা চাকুরি চলে যাবে এবং নাম কেটে যাবে। মৌলভী সাহেব চাকুরির কোনো পরোয়া করেন নি এবং বলেন, আমি ধর্মকে দুনিয়ার ওপর প্রাধান্য দেওয়ার শর্তে বয়আত গ্রহণ করেছি। আমার চাকুরির কোনো পরোয়া নেই। একদিন এটির উল্লেখ হলে হযরত আকদাস (আ.) বলেন যে, নিজে থেকে চাকুরি ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়, এর মাঝে আল্লাহ্ তা'লার অকৃতজ্ঞতা রয়েছে। অবশ্য স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা যদি নিজের কোনো বিশেষ প্রয়োজনে পৃথক করে দেন তাহলে ভিন্ন বিষয়। চাকুরিতে চলে যাওয়া উচিত এরপর বিদায় নিয়ে আসবেন। হযরত আকদাস (আ.)-এর এই নির্দেশে মৌলভী সাহেব বাধ্য হয়ে চাকুরিতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান আর দ্বিতীয়বার বয়আতের পুনরাবৃত্তি করেন। যখন তিনি বিদায় নিয়ে যাওয়া শুরু করেন তখন হযরত আকদাস (আ.) বলেন যে, মৌলভী সাহেবের হৃদয় যেতে চাচ্ছে না। দেখ! ধর্মকে পার্থিব জীবনের ওপরে প্রাধান্য দেওয়ার এটিই অর্থ। মৌলভী সাহেব যাত্রা আরম্ভ করেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পর দেখা গেল তিনি হাসতে হাসতে আর খুশিতে উদ্বেলিত হয়ে বগলে গাট্টি নিয়ে ফিরে আসছেন। সবাই আশ্চর্যান্বিত হন, হযরত আকদাস (আ.) ও মৃদু হাসেন। মৌলভী সাহেব বলেন, আমি যেতে যেতে ট্রেন চলে গেছে। অনেকে বলেছেনও কিছুক্ষণ স্টেশনে অবস্থান করুন এরপর চলে যাবেন। আমি বললাম যতক্ষণ স্টেশনে অবস্থান করবো ততক্ষণ যদি হুযূর (আ.)-এর সাহচর্যে থাকি সেটিই উত্তম, স্টেশনে থেকে কী লাভ?

(তারীকে আহমদীয়াত, প্রতম খণ্ড, পৃ. ৩০৩-৩০৪)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

" তুচ্ছ এ জীবন যাকে নিয়ে এত গর্ব করা হয়। চিরন্তন আনন্দের জীবন সেটিই যা মৃত্যুর পর লাভ হয়।"

(মমালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৬)

দোয়াপ্রার্থী: **Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)**

যুগ ইমামের বাণী

স্মরণ রেখো! কাজ তারাই করতে পারে, অর্থাৎ ধর্মের সেবা তারাই করতে পারে যাদের মধ্যে স্বর্গীয় জ্যোতি বিদ্যমান।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৩)

দোয়াপ্রার্থী: **Jahanara Begum, Bhagbangola, (Murshidabad)**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir